চতুর্থ অধ্যায়

দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাজন ও বিষয়ভাবনার পর্যালোচনা

যুদ্ধের রক্তাক্ত অতীত অতিক্রম করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চিত্র স্বচক্ষে দেখার জন্য খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি আমাদের। অস্থির সময়ের পটভূমিতে ততদিনে ব্যক্তি মানসিকতার অবক্ষয় এক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবন ও জগৎ বাস্তব প্রত্যক্ষ করে বদলে নিতে শিখে গেছে তার নিজস্ব ধরণ। বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ এই কালে দাঁড়িয়ে বিষয় হয়ে উঠলেন। সময়ের হাত ধরে অস্থির কালের প্রতিচ্ছবি অঙ্কণ করতেই এ সময়ের গল্পকারেরা বড্ড বেশি আত্মসচেতন হয়ে পড়লেন। তাঁদের স্বচক্ষে দেখা নিয়তিই ভেসে উঠল ছোটগল্পের আত্মপরিচয়ে। রূক্ষ্ম মৃত্তিকার হাল হকিকতে বিশ শতকের সারিবদ্ধ দর্শকেরাও দেখতে পেল গল্পকারদের বিশেষ সময়ের মানসিকতার প্রতিচ্ছবি। তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসছে একের পর এক ব্যক্তি অবক্ষয় যুদ্ধের অভিশাপ অন্যায় ও অস্তিত্বের সংকট, ভদ্র সমাজের অস্বাভাবিক চড়াই-উৎরাই। অভিজ্ঞতায় ও স্মৃর্তিতে বিশ শতকের ইতিহাসে সংগ্রাহক হয়ে আছে এমন অনেক গুরুগম্ভীর অনালোচিত বিষয়। রবীন্দ্রনাথের মহৎ সৃষ্টি সম্ভারের ছোটগল্পকে পাশে রেখেও, শরৎচন্দ্রের অতি দরদি, মর্মস্পর্শী প্রাণের ছোটগল্প বুকে আগলে রেখেও তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ আলাদা আলাদাভাবে একটা ঘরানা তৈরি করতে পেরেছিলেন। সেখানেও সময় ও তার চরিত্রে এক বিশেষ ভূমিকার স্মরণ আমাদের চর্চায় রাখতে হয়।

মানুষ নিজের ভাগ্যের উপর দাঁড়িয়ে থেকেও তার অসহায়তা সৃষ্টি করছে অন্য কেউ। এই অন্য কাউকে খুঁজতে গিয়ে ছোটগল্পের চরিত্র নির্ভর নির্ভরতা দূরে ঠেলে গ্রহণ করল গল্পের বিষয়বস্তু। বিরাট অবক্ষয়ের ভয়াবহ পরিণাম সামনে রেখে পঞ্চাশের দশকের শুরু হল পথ চলা। আমরা একে একে পেলাম এক ঝাঁক গল্পকারদের। তাঁরা যেন গল্প বলার ছদ্মবেশে নিজ নিজ অবতারে অবতীর্ণ হলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতি, বহু প্রতীক্ষিত ছুঁয়ে দেখা স্বাধীন ভারত,

দেশবিভাগ ও বাস্তুহারা কলরোলের উত্তাল ঢেউ স্থিমিত হয়ে যাওয়ার অনতিদূরে ছিলেন কয়েকজন উল্লেখযোগ্য গল্পকার। এই দীর্ঘ তালিকায় রয়েছেন দিব্যেন্দু পালিত, অজয় দাশগুপ্ত, অমলেন্দু চক্রবর্তী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, দেবেশ রায়, মতি নন্দী, রতন ভট্টাচার্য, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য ও প্রমুখ গল্পকার। এই সমস্ত বিখ্যাত গল্পকারদের গল্পভাবনা নিয়ে মন্তব্য করতে গেলে শাখা-প্রশাখার ন্যায় হাজির হয় একাধিক চিন্তা-চেতনা। গল্প বলার নিজস্ব শৈলীতে এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ইমেজ গড়তে পেরেছেন তাঁর সমকালেই। প্রচলিত ধারার বাইরে বেরিয়ে এসে তাঁরা খোদাই করেছেন গল্পের বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতর স্বাদ।

তবু এই ভিন্নতার মাঝেও যদি বিশেষ একজনকে নির্বাচন করতে হয়, তাঁর গল্প নির্মাণের প্রকৃত গন্তব্যে, তাহলে নিঃসন্দেহে দেবেশ রায়ের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য এবং প্রাসঙ্গিক। কোন নির্দিষ্ট পরিসর দেগে দেওয়া সীমাবদ্ধ রেখা এবং সাল-তারিখের গণ্ডীতে তাঁর ছোটগল্পগুলিকে কোনভাবেই ভূষিত করা যাবে না। তাঁর প্রত্যেকটা গল্পেই আছে চিরচেনা জগতের বৃত্তান্ত; অথচ গভীর খননের দৃষ্টিতে তাদের অচেনা-অজানা বলে মনে হয় আমাদের। তাঁর ছোটগল্পগুলি কোথাও নিজেই সময় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কোন অঞ্চল বা পরিসরের গতানুগতিক সীমা ভেদ করে। প্রকৃতপক্ষে, সময় তার ইশারার আদেশে হাজির করান কখনও কখনও এমন স্বতন্ত্র স্বাদের গল্পকারদের। বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকে হয়তো বহুবার এমন মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছে যে, সময় তার আপন খেয়ালে এক বা একাধিক ছোটগল্পকারকে বিশেষভাবে আহ্বান করেছে। সেই গল্পকারের গল্প বিশ্বে গল্প আকারে প্রকাশিত হয়েছে সময়ের যাবতীয় বিশেষ চরিত্র, তার জ্বালা বা অসহায় রূপটি। ঠিক হুবহুভাবে সময়ের বিশেষ প্রয়োজনে বাংলা গল্পেই মহাকবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছিল, এসেছিলেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক তেমনিভাবেই আবির্ভূত হয়েছিলেন গল্পকার দেবেশ রায়। সেই বিষণ্ণ, বিশৃঙ্খল, অশুভ, নিরন্ন সময়ের জন্য তাঁর উপস্থিতি বড় হয়ে উঠেছিল সেদিন। উল্লেখ্য, গল্পের প্রকৃত আবিষ্কারকে স্পর্শ করতে তিনি দারুণভাবে সফল হয়েছিলেন। এবং এখনও অবলীলায় চলছে তাঁর সাহিত্যচর্চার নিরন্তর অভিযান।

আমরা জানি, কমলকুমার মজুমদার বাংলা ছোটগল্পে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিশেষত গল্প বলার নির্মাণ স্বকীয়তায় তিনি ছিলেন এককথায় অনবদ্য। তেমনি দ্বীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপ্যায় প্রমুখ গল্পকারেরাও যেন পাঁক থেকে তুলে এনেছিলেন ছোটগল্পের অকথিত কথন। দেবেশ রায় আবার এই চলমান বাঁকের যাত্রী হয়েও আগমন ঘটালেন ফাঁক থেকে যাওয়া গল্পের বিষয়বস্তু। কল্পনা সেখানে একটা মাধ্যমের উপায় হয়ে পরে, কেননা বাস্তবতার নিজস্ব আত্মপরিচয়কে তিনি স্পষ্ট দর্শন ও বোধের মিশ্রণে এক অশরীরী ভাবনা থেকে শরীরী ভাবনায় মিলিত করান। এবং মিলন সেতুর রেশ ধরে রাখার পাশাপাশি তাঁকে দেখা গেছে জীবন্ত চিত্রের বহুমুখী প্রকাশ করতে। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে দেবেশ রায় ইমেজ যা এখনও পর্যন্ত রয়েছে। গল্প নির্মাণের বৈচিত্র্যে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা, ঘটে যাওয়া ইতিহাসের স্থির না থাকা চলমানতার কথা ও রূঢ় প্রত্যক্ষের ঘটনা অবলম্বন তাঁর ছোটগল্প আলোচনায় এককথায় খুবই জরুরী প্রসঙ্গ।

তাঁর প্রথম দিকে আত্মপ্রকাশ ঘটা গল্পগুলির মূল সুর খুব গভীরভাবে অনুধাবণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাঁর সঙ্গে অস্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে মহাযুদ্ধোত্তর ও উপনিবেশোত্তর পর্বে। বর্তমান পৃথিবী সেই কালে দাঁড়িয়ে মহাযুদ্ধের অনড় ধ্যানে নিজেই দিশাহীন। উপনিবেশবাদীদের অগ্রগতির বদলে সরে যাওয়া সিদ্ধান্ত সময়ের ভাষাকেই দিয়েছিল বদলে। আবার ধনতন্ত্রের কাছে বিপন্ন হয়ে ওঠার অব্যবহিত ফলাফলে একের পর এক আক্রমণের ন্যায় ধেয়ে আসছিল আর্থ-সামাজিক টানাপোড়েনের একঘেয়ে চিত্র। তাই জলবায়ুগত একটা অসুস্থতা যখন ছড়িয়ে পড়ল তখন সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতির মতোই পৃথিবীর চরিত্র ও তাঁর রূপের পরিবর্তন ঘটে যাওয়াটাও ছিল না অস্বাভাবিক। একটু আগেই বলেছি, ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর হিতে বিপরীত কালই এসেছিল মর্মান্তিকভাবে। ফলে জাতিগত ভেদাভেদ একে অপরের প্রতি বিশ্বাস হারানোর মতো পান, দেশত্যাগ ও বাস্তুহারাদের ভাগ্য সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিপতিদের হাতে ঘুরপাক খাচ্ছিল অসহায়ভাবে। দেবেশ রায়ের সামনে এই অপ্রিয় সত্য এড়িয়ে যাওয়া বোধহয় সম্ভব ছিল না। সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

সমবেত স্বরের উচ্চারণ নিয়ে তাঁর গল্পগুলি খুঁজে নেয় নিজস্ব কক্ষ পথ। কারণ, একথা তিনি বারবার প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে স্বীকার করেছেন। লেখালেখি শুরুর সময় থেকে এ পর্যন্ত গল্পে আন্দোলনের একটা বার্তা তিনি ঘোষণা করেছেন। সেখানে প্রকরণ বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি জানান। ফলে 'হাড়কাটা' গল্প দিয়ে যে প্রকাশ তিনি তুলে ধরেছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রকরণ, আন্দোলন সমবেত স্বর সেখানে ভূমিকা নিয়েছে অপরিহার্যভাবে। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তিনি অনবরত লিখে চলেছেন। সতর্ক পাঠক জানেন সময় ও ঘটনার ফাঁদে পড়ে তাঁর গল্পে বদল হয়ে যাওয়া ইতিহাস। ছোটগল্পের বিচার বা প্রকরণের দক্ষতা ও ভিন্নতা নিয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন তাঁর নিজস্ব দর্শন থেকে, তেমনি গল্পের সীমাবদ্ধ আকার, আকৃতি বা ভাষা প্রকরণের লিমিটেশনকে তিনি মানতে চান নি। বরং অবলীলায় তার বহিঃপ্রকাশের উপর সর্বদা জোর দিয়েছেন। অভিজ্ঞতার গভীর ভাবনা দিয়ে বড় অর্থে একটা বিশেষ পরিস্থিতিকে রূপ দেওয়াই অন্যতম লক্ষ্য হয়ে উঠেছে, এবং গল্পের ভেতরে প্রাণ বিস্তারে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে চরিত্রের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়াটাই বড় দায় দেবেশ রায়ের কাছে। পরবর্তী আলোচনায় যখন যাব তখন দেখতে পাব তিন বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার, জগদীশ গুপ্ত প্রমুখ গল্পকারদের প্রতিষ্ঠিত কলাকৌশল স্বীকার করেও তিনি গল্প লেখার বিষয়ে কতটা সতর্ক ছিলেন। নিজেকে একেবারে পৃথকভাবে গড়ে তোলার একটা ধারা তিনি প্রথম থেকেই নিয়েছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

শিল্প-সৃজনে, ফর্মে ও কনটেন্টে স্পষ্ট ভাবে জোড় দেওয়া দেবেশ রায় ছাড়া খুব কম গল্পকাররাই সম্ভবত প্রয়োগ করেছেন। সমসাময়িক বা তার পরবর্তী গল্পকারদের একটু-আধটু প্রভাব থাকাটা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়, তবে সবদিক থেকে সূক্ষ্মভাবে দেখালে বোঝা যায় তাঁর গল্প কোন্ অর্থে স্বতন্ত্র্য বা নতুন। সমালোচক অরুণ সেন দেবেশ রায়ের গল্প সৃষ্টির নির্মাণ প্রক্রিয়ায় নিবিষ্ট হয়ে বলেছেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা। তাঁর মতে—

> ''দেবেশ রায় যখন এইসব লেখাগুলো লিখছেন, হয়তো পথসন্ধানের আন্তরিকতা ও অনুশীলনের সততাতেই এসব উপন্যাসে একেক রকম পক্ষপাত ঘটতে থাকে। বিশ্বের এবং নিজের ভাষার পূর্বসূরিদের কাছ

থেকে পরোক্ষ ও সচেতন গ্রহণ-বর্জনও চলে। কারো-কারো মনে হতে পারে, এখানে তিনি জগদীশ গুপ্ত থেকে নিচ্ছেন, ওখানে কাফকা থেকে। কিন্তু এতই তাৎক্ষণিক ও ব্যক্তিগত সে-প্রভাব যে তার অনুসন্ধানও অবান্তর মনে হয়। এমনকী লেখক নিজে যদিও তলস্তয় ও বালজাকের আদর্শকে শিরোধার্য করেন, এবং বিভিন্ন কথায় বা লেখায় সতীনাথ ভাদুড়ী বা কমলকুমার মজুমদারের প্রতি জানান শিল্পগত সমর্থন—এবং তার পাঠক কখনো-কখনো চিনতেও পারেন কীভাবে তিনি তাঁদেরকে ব্যবহার করেছেন উপন্যাসের ফর্ম বা ভাষার নির্মাণে—তবু এসমস্তই যে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে গড়ে তোলার আয়োজনেই ব্যবহৃত হচ্ছে, তাঁর পরিণতিতে এ-সবের আঁচড় যে একেবারেই নেই তা বুঝতে একটুও সংশয় হয় না।''[১]

স্বভাবতই গল্পকার দেবেশ তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্যে আপন দিক বজায় রাখতে পেরেছেন।

ছোটগল্পের তারতম্য ও বিষয়ভাবনা আলোচনা করলে তিনি কিছু জরুরী মতামত রেখেছেন বিভিন্ন জায়গায়। পঞ্চাশের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে বাংলা গল্পে বিপ্লবের সূচনা ও সেই সূচনাকে সংজ্ঞায় রূপান্তরিত হওয়ার বিশেষ অবস্থাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। যদিও তিনি এও মনে করেন যে, আধুনিক ছোঁয়া অনুভব করতে বাংলা ছোটগল্প উপন্যাসকে বেশ খানিকটা সময় ব্যয় করতে হয়েছে। তবে আধুনিকতার আবেগ সেদিন অনেককেই গভীরভাবে নাড়া দেয়, এবং তাঁরা নিজ পথ অনুসন্ধানে নেমে আসেন। বাংলা গল্প আদৌ কেমন হওয়া দরকার তার রূপ ও স্বরূপ, চরিত্র, আঙ্গিক, সংলাপের মেজাজ কেমন হলে ভাল হয়—তার ঋতু পরিবর্তন নিয়ে মাথা ঘামানোর একটা আদল তৈরি হয়। এবং তাতে তিনিও সামিল হন। দেবেশ রায়ের ছোটগল্প নিয়ে ভাবতে বসলে বারবার একথা মনে পড়তে বাধ্য যে, তিনি নিজের ভিতরেই আবিষ্কার করতে চান বহুদূরগামী একটি সরলরেখা; যেখানে রচনার মধ্য দিয়ে দিকশূন্যহীন অভিযানে বেরিয়ে আসবে অদ্বিতীয় ইতিহাসমালা। সীমাবদ্ধ গণ্ডী ও সময় রেখা ভেদ করে গল্পের সমবেত স্বরই একমাত্র মুখ্য হয়ে উঠবে। তাঁর মতে,

''কত চেহারা আর চাহনিকে তার অব্যবহিত থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। মুখের কোনো কথাকে নিটোল তুলে এনেছিলাম প্রসঙ্গের মাটি শিকড় ঝরিয়ে দিয়ে অন্য এক মাটিতে তাকে প্রোথিত করতে। সেই যেন ছিল কাজ, সেইই একমাত্র কাজ—নিজেকে সরিয়ে ফেলা, লুকিয়ে ফেলা, লুপ্ত করে ফেলা। নিজের কোনো অতৃপ্ত আকাঙক্ষার শূন্যতা পূরণের জন্যে গল্প নয়। নিজের জীবনের সঙ্গে কোনো সূত্র দৃশ্য রাখা গল্প লেখার কাজ নয়। বাস্তব যেন বহু বিচিত্র আকারের এক প্রান্তর—সেখানে নিজের ছায়া নিজে মাড়ানো যায় না। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সেই আয়াসে বস্তুকে বস্তুর আকারে চিনে নেওয়ার সেই চেষ্টায় কত নতুন প্রকরণ খুঁজে বেড়াতে তখন ইচ্ছে গেছে। বানানের কত কৌশল যতি চিহ্নের কত ব্যবহার, বাক্যগঠনে কত ভাঙন। প্রত্যেকটি পরবর্তী লেখা তার আগের লেখার পরিবেশ বদলে দেয়, অর্থ বদলে দেয়, প্রকরণ বদলে দেয়। খণ্ডে খণ্ডে এই 'গল্পসমগ্র' প্রকাশ তাই হয়ে উঠতে চাইছে আমার নিজেরই কাছে নিজের এক পাঠোদ্ধার।''[২]

সমসাময়িক বাংলা ছোটগল্পকাররা এক নির্দিষ্ট গতিতে চললেও দেবেশ রায় ছোটগল্পের ক্রম বিবর্তন নিয়ে একটি ঘরানা তৈরি করেছেন। ক্রম বিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি একাধিক জায়গায় তার কারণগুলি খুলেও বলেছেন। বিবর্তন যখন একজন রচয়িতার জীবনে সৃষ্টি বৈচিত্র্যে তারতম্য ঘটায়, তখন তাঁর সৃষ্টির আবেদন থেকে ভেদ করে উঠে আসে রচনার শ্রেণিবিভাজন ও বিষয় ভাবনার বহুমুখী দৃষ্টিকোণ। নিঃসন্দেহে দেবেশ রায়ও এর ব্যতিক্রম নন। যদি পঞ্চাশের দশকে ছোটগল্পের মূল প্রাণ অনুসন্ধান করতে যাই, দেখব দেবেশ রায় দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে যেন নিজের গল্প নিয়ে নিজেই নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। সর্বোপরি, একটা ইমেজের ধারাও তৈরি হয়েছে অবলীলায়। 'দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাজন ও বিষয়ভাবনার পর্যালোচনা' এই বিষয়টিকে ভেঙে দেখলে স্পষ্ট হয় তাঁর প্রথম জীবন থেকে আরম্ভ করে বর্তমান জীবনের লিখে চলা গতি পর্যন্ত এসেছে অজস্র গল্প পরিবেশ তৈরি করার বিচিত্র ভঙ্গি। সেগুলিকে শুধু একটি বা দুটি ভাগে

ভাগ করা নয়। বেশ কয়েকটি ভাগে করে দেখা প্রয়োজন। যেমন; ক. মনঃস্তত্ত্বমূলক, খ. রাজনৈতিক বাতাবরণমূলক ছোটগল্প, গ. সমাজ চেতনামূলক, ঘ. অর্থনৈতিক সংকটমূলক ছোটগল্প, ঙ. দাম্পত্য জীবনমূলক ছোটগল্প, চ. নৈতিক চেতনার হ্রাস, মূল্যবোধহীনতা ও হতাশার গল্প ইত্যাদি বেশ কয়েকটি পর্যায়ে বিভাজন করে দেখলে তাঁর ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাজন ও বিষয় ভাবনার পর্যালোচনাকে স্পর্শ করার একটু প্রচেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

মানুষের সাথে মানুষের সংঘাতের চিত্র তাঁর প্রথম জীবনের বেশিরভাগ ছোটগল্পেই চিত্রিত হয়েছে। স্বাভাবিকতা ক্ষয়ের একটি বড় বৈশিষ্ট্য মানুষ নিজের জীবনকে করে তোলে বিষাদময় আর সেখান থেকেই বর্তমান জীবনকে নিয়ে হতাশা, যন্ত্রণা, নৈতিক চেতনাহীনতা তাকে গ্রাস করে ফেলে। 'হাড়কাটা', 'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা', 'পা', 'কলকাতা ও গোপাল' জলধর ব্যানার্জির মৃত্যু 'দুপুর' ইত্যাদি গল্পগুলিতে আলোচনা করার চেষ্টা করে দেখাব মনঃস্তত্ত্ব নিয়ে গল্পকার দেবেশ রায়ের কথন বিশ্ব কীভাবে ধারণ করেছেন মনঃস্তত্ত্বের গভীর দুঃসময়গুলিকে। দেবেশ রায় আবাল্য রাজনীতির মধ্য দিয়েই বড় হয়ে উঠেছেন। ফলে রাজনীতির প্রত্যক্ষ অনুভূতি ছাত্রজীবনে প্রভাব পড়লেও রাজনীতি নির্ভর গল্পের ভাষা অনেকটাই অচেনা বলে মনে হয়। বিশেষত কমিউনিষ্ট পার্টির আন্দোলন মুখর দিন থেকে তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক বোধ নিয়ে তিনি চিন্তা ভাবনা করেছেন অনেক। স্বভাবতই ছোটগল্প লেখার ক্ষেত্রে রাজনীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাব লক্ষ্য করা যায়। মনঃস্তত্ত্বমূলক গল্পের রেশ শেষ হতে না হতেই রাজনৈতিক বাতাবরণমূলক গল্প পেতে খুব একটা দেরী হল না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুভব করা রাজনীতিমূলক ছোটগল্পগুলি হল 'উদ্বাস্তু', 'মানুষ রতন', রাষ্ট্রপতির শাসনে', 'নিরস্ত্রীকরণ কেন', 'ক্ষয় ও তার প্রতিকার', 'মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট', 'আমিষ নিরামিষ', 'কয়েদখানা' প্রভৃতি। আবার একইভাবে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন সমাজচেতনামূলক ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও। সমাজের ভেতরে অনেক রকম সমাজ থাকে। তার রূপ অঙ্কণ করতে হলে সমাজচেতনার সুদূরে ভাসাতে হয়। গল্পকার দেবেশ তার পরিচয় দিয়েছেন বেশ দক্ষতার সঙ্গে। সমাজচেতনামূলক গল্পগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'ভয়', 'দুপুর', উদ্বাস্তু', 'গীতাল যুগীনের টেকনোলজি

গ্রহণ', 'অনৈতিহাসিক', 'স্বপ্ন জাগরণের ব্রত', 'অন্ত্যেষ্টির রীতিবিধি' ইত্যাদি।

তাঁর একই গল্প অনেক সময় বহুমুখী দ্যোতনার ভাষা হয়ে উঠেছে। যেমন 'আত্মসচেতনার ফাঁকফোকর', 'কলকাতা ও গোপাল' মনস্তত্ত্বমূলক, নৈতিক চেতনার হ্রাস মূল্যবোধহীনতা প্রকাশ করে তেমনি আবার একইভাবে, অর্থনৈতিক সংকটমূলক ভাবের প্রকাশকেও উদ্রেক করে। অর্থনৈতিক সংকট এই সমস্ত গল্পগুলিতে চরিত্র-কাহিনির মিশ্রণে। নানাভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দাম্পত্য জীবনমূলক গল্পগুলির মধ্যে 'অসুখ' গল্পটি অন্যতম। এখানে অনুরাধা তার শরীরের সাথে লড়াই করে যায়, তার পাশাপাশি স্বামী অবিনাশ এর সাথে সংসার করতে করতে দেখা যায় বিবাহিত জীবনের শুভদৃষ্টি, সাত পাকে বাধা রূপকথার চাদর সরিয়ে এই গল্প দাম্পত্য সংকটের গভীর অসুখকে প্রত্যক্ষ করে। কামনা-বাসনার গতানুগতিক সাংসারিক জীবনে ভালোবাসা না বাসার দ্বন্দ্বই দাম্পত্য সংকট ধীরে ধীরে প্রকট করে তোলে। 'ইচ্ছামতী' গল্পে আবার উমা, দীপকের চাওয়া-পাওয়ার ভেতরে দাম্পত্য জীবনের পূর্বাভাস ঘনিয়ে আসে তেমনি বাস্তবতার দৃষ্টি দিয়ে তারা দেখতে পায় দাম্পত্য জীবন থেকে সংকটের ঘনঘটা। এইভাবে চড়া বিষয় সামনে রেখে দেবেশ যেন খানিকটা আলো-আঁধারির ছলে দাম্পত্য জীবনের অতীত বর্তমান-ভবিষ্যকে একই তুলিতে ধরতে চান। সর্বোপরি, দাম্পত্য জীবনের ধারালো বাস্তবতাকে যেন তিনি সংকটের পটভূমি থেকে অনুবাদ করেছেন।

বিবিধ গল্পগুলির মধ্যে 'কাল রাতের বেলায়', 'পশ্চাৎভূমি', ' বেড়ালটির জন্য প্রার্থনা', 'পায়ে পায়ে', 'অপেক্ষায়', 'সুখের দরদাম', 'সাধারণ চক্কোত্তির জীবনসূত্র', 'জরিপ', 'একই কথার দুই আরম্ভ', 'মিঠির মেজ মামা', 'ঠিকানা আর ঠিকানা' 'বাধ্যতা আর বাধ্যতা' উল্লেখযোগ্য। একাকিত্বকে সঙ্গী করে স্মৃতি নিয়ে বাঁচার গল্প এখানে দেখা যাবে। একজন মানুষের আত্মভাবনা থেকে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব কীভাবে কুড়ে কুড়ে খায় তার বর্ণনাও রয়েছে। দেশভাগের যন্ত্রণা কত মহাবিপর্যের প্রতীক, কীভাবে তা তিলে তিলে মনুষ্যত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তার বেদনাদায়ক গল্প বিবিধ ধারার মধ্যে রাখব। আধুনিক যুগের উল্লেখযোগ্য অবদান গণমাধ্যমের গভীর সত্যকে কোথায় নিয়ে যায়, মানবিকতার স্বাভাবিকতা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায় কেন—সেই বিষয়গুলোও এখানে আলোচনা করা হবে। সবমিলিয়ে নানা

দেবেশ রায়ের একটি চিত্র এখানে গল্পগুলির সুরকে কেন্দ্র করে একটি স্বরূপ অঙ্কণ করার চেষ্টা করা হবে।

ক. মনস্তত্ত্বমূলক ছোটগল্প :

মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্পে ঘটনার ঘনঘটা বেশি থাকে না। তার থেকে মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া গল্পের জাল বিস্তার করে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ব্যক্তিচেতনার নানা উত্থান-পতন মনস্তাত্ত্বিক গল্পের প্রাণ।

দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের দ্বিতীয় খণ্ড সংকলনের 'যুযুৎসু' গল্পটি এই মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম।

'যুযুৎসু' গল্পের চরিত্র মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী। অভাবের তাড়না তাকে ক্রমশ নিচের দিকে টানতে থাকলেও হাবে ভাবে, পোশাকের সম্ভ্রান্ত আতিশয্য না থাকলেও তার ভদ্রস্থ পরিধানে একটা সাবেকি ভারিক্কি চাল রয়েছে। অন্ততঃ বলা যেতেই পারে মণীন্দ্রনাথ অর্থে হীন, মনে নয়। কিন্তু অর্থ ছাড়া তো আর সম্ভ্রান্ত অবস্থা ধরে রাখা যায় না। পেটের দায়ে তাকে প্রথমে কন্ট্রোলের দোকানে খাতা লেখার কাজ, তারপর ওষুধের দোকানে কম্পাউণ্ডারি, সিনেমা হলের গেটম্যান আরো অনেক পেশার সাথে যুক্ত হতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মহীনগর কলেজে চাকরী পায়। কলেজে পদাধিকার বলে সে রেয়ারা হলেও তার ভেতরে থাকা উচ্চ মানসিকতা, জীর্ণ পোশাকেও সম্ভ্রান্ত ঢং-এ পরিধান তাকে বেয়ারাদের থেকে অনেক ক্ষেত্রে আলাদা করে রেখেছিল। যদিও অফিসের ভেতর ঘরের বেল বাজলেই তাকে উঠে দাঁড়াতে হত, প্রয়োজনীয় সামগ্রী এনে যোগান দিতে হত। মণীন্দ্রের এই উচ্চ মানসিকতা অথচ কর্মে সাধারণ বেয়ারার স্থান এতদিন যতটা সম্ভব গা-সওয়া হয়ে গেছিল। কিন্তু গোল বাধল মেয়ে যখন হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে মহীনগর কলেজে ভর্তি হল। এতদিন পরিবারের সামনে যা ছিল লুকানো, অন্তত বাড়িতে নিজের আভিজাত্যটুকু রক্ষার উপায় ছিল, আজ মেয়ে ভর্তি হয়ে সেই জিইয়ে রাখা আভিজাত্যে যেন ক্ষয় ধরিয়ে দিল। এখন মেয়ের সামনেই তাকে এটা ওটা আনাজ কাজ করতে হয়, বেল বাজলে মেয়ের ক্লাসে গিয়ে চক ডাস্টার দিয়ে আসতে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়ের চেয়ারের পাশে মাটিতে বসতে হয় পিতা

মণীন্দ্রনাথ চৌধুরীকে। বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মণীন্দ্রনাথের মন। নিজের এই ক্রম অবনমন বাধ্য হয়ে তাকে মেনে নিতে হয়েছে কিন্তু সেই কর্মস্থলে মেয়ের উচ্চ আসন অবচেতন মনের গভীরে একটা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে শুরু করল মণীন্দ্রনাথ নিজেকে, গত বারো চোদ্দ বছরের ঘটনার নানা গতিকে, চতুস্পার্শের সঙ্গে নিজের উত্থান পতনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে। নিজের প্রাক্তন শ্রেণির প্রতিনিধি ঠাওরালো মেয়েটিকে, যে মেয়েটি জন্মের পর থেকে দোকানি, কম্পাউণ্ডার ও বেয়ারার মেয়ে হয়েই উঠেছে। কলেজের ছাত্রী যেন তাকে রাতারাতি এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। যে শ্রেণির, যে সম্ভ্রান্ত পদমর্যাদার উত্তরাধিকারী মণীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন, দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু হওয়া—এই সমস্ত কারণে সেই জীবন থেকে বিচ্যুত হলেও আত্মগরিমা, উচ্চাঙ্গ মানসিকতা বিসর্জন দিতে পারে নি। অর্থ উপার্জনের তাগিদ আজ তাকে বেয়ারায় পরিবর্তিত করেছে। উপরন্তু মেয়ের সম্মুখে তার এই নিম্ন সম্মানীয় পেশা তাকে উদ্ভ্রান্ত করছিল ভেতরে ভেতরে। এই যন্ত্রণা জাল থেকে বেরনোর জন্য সে নতুন গড়ে ওঠা ইঞ্জিনিয়ার কলেজে বেয়ারার পোষ্ট-এ আবেদন করে। ওখানে চাকরিটা সরকারী। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর নিশ্চিত পেনশন। তারও চেয়ে বড় দরকার মহীনগর কলেজের চাকরিটা ছাড়ার, কারণ নিজের মেয়ের পায়ের তলায় তাকে বসতে হয়েছে। ইন্টারভিউ যারা নেবে তাদের দু-একজনের বাড়ি গিয়ে বলেও এসেছিল তার চাকরিটা পাকা করে দেবার। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার মন দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। সেখানকার চাকরিটা সরকারী, মাইনে বেশি, পেনশন আছে, সেখানে মেয়ে নেই। কিন্তু নিজের সম্ভ্রান্ত, উচ্চ মানসিকতা রক্ষাকারী তার পোশাকের বর্মটা সেখানে আর রক্ষা করা যাবে না। সেখানে বেয়ারাদের খাকির মতো নির্দিষ্ট পোশাক রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভাবসাব এত নিরপেক্ষ ও ব্যক্তি শূন্য ও যান্ত্রিক যে, মণীন্দ্রনাথের যে-ব্যক্তিত্ব অন্য সাপেক্ষ ও করুণা সহানুভূতি ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে, সে ব্যক্তিত্ব এখানে মারা যাবে।

শেষ পর্যন্ত বয়স, আর সাইকেল চড়া না জানার কারণে অনায়াসে ইন্টারভিউ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয় মণীন্দ্রনাথ। বাড়ি ফিরলে মেয়ে মায়া যখন ইন্টারভিউয়ের খবরাখবর জিজ্ঞেস করার পর সেখানকার বেয়ারাদের উর্দি পরার প্রসঙ্গ তোলে, কারণ মায়াও জানে

তার বাবার সেই ব্যক্তিত্বের কথা, তখন দপ্ করে জ্বলে ওঠে মণীন্দ্রনাথ। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মায়াকে বলতে থাকে—

> ''কেন, আমি উর্দি পড়লে তোমার সম্মানে লাগবে, ছেলেমেয়েদের সামনে তোমার মাথা নিচু হবে যে তোমার বাবা উর্দি পরা বেয়ারা, রেয়ারাই যখন হয়েছি, বামুনের ছেলে যখন সব ছোটজাতের পায়ে তেল ঘষতেই পেরেছি, তখন আর আমার আছে কি।''[৩]

এই তিরস্কার আসলে মণীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের আত্মগ্লানি। এই কথাগুলি আসলে মণীন্দ্রনাথের বিক্ষুব্ধ চেতনার ফসল। যার আগুন তাকে প্রতিটা মুহূর্ত পুড়ে ছাই করে দিচ্ছে। অন্যদিকে তার মেয়ে বেয়ারার সন্তান থেকে ধীরে ধীরে আপন আসন পরিবর্তিত করছে পড়াশুনার মধ্য দিয়ে। মণীন্দ্রনাথ ডুবছে, মেয়ে উঠছে। মণীন্দ্রনাথের এই অবনমন এবং মেয়ের এই উত্থান ভেতরে ভেতরে চেতনার গভীরে এক দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। পিতাপুত্রীর অতল স্নেহ-ভালোবাসার ক্ষেত্র ছিন্ন করে তারা—এমন একটি ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, যেখানে তাদের দু'জনের মধ্যে পারিবারিক বা মানসিক কোন বন্ধন নেই নিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রামের বন্ধন ব্যতীত।

গল্পটিতে দেশভাগ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে জন্মভিটা থেকে উৎখাত হওয়া ব্যক্তিত্বপূর্ণ সম্ভ্রান্ত মানুষের ক্রমহীনতর জীবনের জাঁতাকলে পিষ্ট আত্মার আর্তনাদকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

চেতনার টানাপোড়ান, চোখের সামনে ভেঙ্গে যাওয়া পুরনো বিশ্বাস, মূল্যবোধের নির্মম পরিহাস, শেকড় ছেঁড়ার আর্তনাদ ফুটে উঠেছে দেবেশ রায়ের 'সিঁড়িভুল' গল্পে। গল্পটি রাজবংশী ভাষায় লেখা। রাজবংশী ভাষায় লেখা পত্রিকা 'ডেগর', ২০০৬ সালে প্রকাশিত 'নমলা সংখ্যা'য় প্রকাশ পায় দেবেশ রায়ের এই গল্পটি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন মানুষের মানসিক এবং স্থানিক শেকড়হীনতা, পুরোনো সামাজিক বন্ধনের ধ্বংস, ৭৭ বছর বয়সী ড. জে. এন. চৌধুরীর আত্মার অন্তর্লীন রক্তাক্তের ছবি গল্পটিকে একটা যন্ত্রণার, দীর্ঘশ্বাসের অবয়ব দিয়েছে। জে. এন. চৌধুরী সাবেকি আমলের একান্নবর্তী পরিবারে বেড়ে ওঠা জীবন এবং মন মানসিকতার, মূল্যবোধের ধারক এবং

বাহক।

> ‘‘উমার টাইমত কায়ও তো আট দশঝন ভাইবইনির কম আছিল না। বাপরে ঘর চাইর ভাই আর আমরা চাইর ভাই—আটঝনক আট দিয়া গুণ করিলে তো চৌষট্টি হওয়ায় খাবে। তার বাদে বিধুয়া বইনি আছে, বিয়াতি গরীব বইনির ছাওয়াছোট আছে—শওখান মানষির সংসার।’’[৪]

এই পরিকধিতে বেড়ে ওঠা ড. চৌধুরী একসময় বিদেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেকড়ের টান কখনো ছিন্ন হয়নি। প্রথমত পুরাতন মূল্যবোধ তাঁকে বিদেশের মাটিতে ধরে রাখতে পারে নি, উপরন্তু তৎকালীন আমেরিকা সরকারও বিদেশী প্রতিভাকে চাকরি দিতে অতটা উদার ছিল না। উপরন্তু দেশকে প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা, আপন জন্মভিটার টান হয়তো তাকে বিদেশের মাটিতে ধরে রাখতে পারতও না। কিন্তু তার ছেলে এবং মেয়ে এখন বিদেশের মাটিতে আরও উন্নত জীবন, আরও জীবনের উন্নতি ঘটানোর জন্য উন্মুখ। ড. চৌধুরীর মেয়ে বড়, তারপরে একমাত্র ছেলে। বেটা-বেটাবৌ-নাতি-বেটি-জাঙোই-নাতিনি, সগার কথা ভাবি ডক্টর চৌধুরী সন্তোষপুরত একখান তিনতলা বাড়ি বানাইছে। একখান তলা বেটির। একখান তলা বেটার। একখান তলা নিজের। নিজের যাপিত জীবনের মতো করে ভেবে ড. চৌধুরী বাড়ি বানিয়েছেন। কিন্তু আজ ছেলে বউমা আমেরিকাতে চাকরি করছে, ওখানে থাকছে। একটা সময় এল, মেয়েও বিদেশের মাটিতে ঘাটি করার জন্য তৈরি হল। ছেলের বিদেশে যাবার বেলায়ও এই মেয়ে বুলবুলিই তাকে বুঝিয়েছে—‘‘বাপো, চিন্তা করিস না বা। ভাইয়ের চাকরিত ক্যানং উন্নতি হবে দেখিস।’’[৫] চৌধুরীর পাল্টা প্রশ্ন ছিল—‘‘এইটেকার সব কাজত অ্যালা উন্নতি বন্ধ হয়া গেইছে।’’[৬] সন্তানকে বুকের কাছে, চোখের আগায় আগলে রাখার একটা চেষ্টা ড. চৌধুরী করেছিলেন। শুধু তাই নয়, চৌধুরীর পুরাতন মূল্যবোধের নিরিখে দেশের প্রতি যে দায়বদ্ধতা যে গৌরব লুকিয়ে রয়েছে তাকেও সম্মান জানানোর সদিচ্ছা প্রকাশ পায় তার চেতনার অন্তর্নিহিত এই আকুতির মধ্য দিয়ে। যে দেশে শুক্রচার্যের মত পণ্ডিত ছিলেন, সে দেশের সংস্থানে তার ছেলের যোগ্যতার চাকুরী নেই! যে ঘর ভাঙার তা সে ভাঙবেই। ছেলের বিদেশ-ঘর তৈরির আরও কারণ ছিল। যেটা প্রত্যেকটা ঘরে হয়—শাশুড়ি-বউমার অসন্তোষ। নতুন ভাবধারায় পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা অচল। তাই নিউক্লিয়ার

ফ্যামিলি শব্দটার বেশ চল। তাই বিদেশ যাওয়া পাকা হয়ে গেছিল ড. চৌধুরীর ছেলের। একমাত্র মেয়েকেও সে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল। সেই ভাবনা থেকেই যে তার বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা এর আগেই আমরা জেনেছি। কিন্তু ছেলে বিদেশ যাবার পরে মেয়েও অস্বীকার করে বুড়ো বাপ মায়ের কাছে থাকতে। প্রথম কারণ তার শিবপুরের স্বামী সংসার রয়েছে, দ্বিতীয়ত শিবপুরেই যে তার স্থির আস্তানা থাকবে তারও নিশ্চয়তা নেই। মেয়ে বুলবুলির মনও উন্নত জীবন, উন্নত উপার্জনে উন্মুখ। একসময় সেই সময়ও ঘনিয়ে আসে। স্থির হয় মেয়ে জামাই আমেরিকাতে যাচ্ছে। ক্ষয় ধরতে থাকে চৌধুরীর পুরাতন মূল্যবোধের (ভ্যালুস) দৃঢ় শিক্ষার। ভাঙতে ভাঙতে তিনি সংসারে একা হয়ে গেলেন। তিনি ভেবে পান না এই পারিবারিক অটুট বন্ধন কীভাবে আলগা হয়ে গেল। — ''ড. চৌধুরী বুঝির না পায়- উমার ৭৭ বছরের জীবনত ভাত আর আঁতের বাঁধনিখান অ্যানং হুসকি গেইল কেনে?''[৭] যেখানে যুক্তির, যেখানে বুদ্ধির যুগ, যেখানে বিজ্ঞান মানুষের জীবন নিয়ন্তা সেখানে ড. চৌধুরী আজ একা হতে বাধ্য। তিনি যে একটা যুগের, আজ যে সে যুগটা নেই এটা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণায় হচ্ছেন ক্ষতবিক্ষত। মেয়ে তাকে 'ছোট একটা গিলাসের নাখান' বস্তু দিয়ে গেছে। যার দৌলতে পৃথিবীর যে কোন কোণে থাকা মানুষের সাথে সংযোগ করা যায়, নম্বর টিপিলে কথা বলা যায়। অর্থাৎ মোবাইল। এই মোবাইল নিয়েই একটা মানুষ তার অবসর যাপন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু দেখতে এবং শুনতে পারে। অন্য কোন মানুষের আলাদা করে প্রয়োজন হয় না। লেখক আসলে যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার দিকে ইঙ্গিত করছেন এই মোবাইলের প্রসঙ্গটিকে উল্লেখ করে। ড. চৌধুরী মোবাইল চালাতে পারে না। অর্থাৎ ড. চৌধুরী মানুষের এই যান্ত্রিক নব্য জীবনে অভ্যস্ত হতে, নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভেসে আসা নাতির মুখ দেখে স্বস্তি পাচ্ছেন না।

জন্মলব্ধ চেতনা, মূল্যবোধের এই সর্বৈব ভাঙন ড. চৌধুরীর অবচেতনে অন্তক্ষরা বেদনার মতো বয়ে চলেছিল। যে গৃহকোণকে অটুট করতে সারাজীবন বিধি ব্যবস্থার কমতি করেননি, ৭৭ বছর বয়সে তার জীবন সেই আশায় ছাই দিয়ে সমস্ত কিছুকে তছনছ করে দিল। বৃদ্ধের একমাত্র সম্পদ তার উত্তরাধিকার। তারা আজ দূরে। শেকড়ের টান তাদের

কাছে মূল্যহীন। সন্তোষপুরের তিনতলা বাড়ি যেন ড. চৌধুরীকে ভুল প্রমাণ করে উপহাস করছে।

চেতনায় ভেসে ওঠা নানান ছবি, চেতনার গভীরে পাক খাওয়া দোলাচল, সিদ্ধান্ত এবং আশঙ্কার সম্মিলন ঘটেছে দেবেশ রায়ের গল্প গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত 'আত্মসচেতনতার ফাঁকফোকর' গল্পে। সেখানে যেমন বেশি চরিত্রের ভীর নেই। তেমনি যে সমস্ত চরিত্র গল্পের প্রয়োজনে এসেছে তারাও বেশি কথা বলেনি। অথচ একজন বেকার যুবকের আত্মচেতনায় ফুটে উঠেছে তার দৈনিক জীবনযাত্রা, আত্মসম্মান, নিরালম্ব মনোভাব এবং প্রতিষ্ঠা-অন্বেষিত একটা তাগিদ।

গল্পের প্রধান চরিত্র বিশু কুড়ি বছরের যুবক। বেলেঘাটার রাসমণি বাজারে নিউ পোদ্দার ডেকরেটারের উল্টোদিকের ফুটে চায়ের দোকানে বেঞ্চির বাইরের দিকটাতে বিশু বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ এসে বসে। দোকানটা আশাদের। ফুটপাথে এক চিলতে জায়গায় কম আসনের এই চায়ের দোকানে খদ্দের নয় এমন লোক বসে থাকা বেমানান। খামোকা জায়গা দখল করে রেখে আড্ডা দেওয়ার মত নয়। এটা বিশুও জানে। সকালে এবং দুপুরের খরিদ্দারের ভিড় থাকে। অন্যসময় মোটের উপর ফাঁকা থাকে বসবার বেঞ্চটা। তাই বিশুর এখানে আসা দশটার পরে, যখন দোকানটা ভিড়ে আকীর্ণ নয়। বিশু আত্মসচেতন। কোনদিন যদি আশা বলে বসে— 'এই, চা খাবে তো খাও, না হলে মিছিমিছি জায়গা নিয়ে থেকো না।' অশ্রুতপূর্ব সম্মান হানির আশঙ্কাতেই সে ফাঁকা সময়ে আসে কাজের খোঁজে এবং বসে থাকে চায়ের দোকানে। অন্যদিকে আশা চোদ্দ বছরের কিশোরী। কোথাও পাওয়া মেক্সি পায়ের কাছের অংশটি ভাঁজ করে যখন কোমরে বেঁধে তার কাজে ব্যস্ত থাকে তখন কি বিশুর অন্যরকম অনুভূতি হয় না? হয়তো নয়। কাজের খোঁজ এবং ম্যাক্সি তোলা আশা দুটো বিষয়ই কি বিশুর চেতনে কোন তাগিদ দেয় না।

বিশু কাজের খোঁজে বেড়োয়, কিন্তু প্রথাগত কাজের খোঁজ যেভাবে করা হয় যেভাবে নয়। অন্যদিকে কেউ কাজের জন্য লোক খুঁজতে বেরোলেও হাতের কাছে বিশুকে পেলেও সব কাজে তাকে ডাকে না—তাকে কেউ টেম্পো থেকে আলুর বস্তা নামাবার কাজে ডাকবে না। সে কাজ করার জন্য কুলি না থাকলেও ডাকবে না। বিশুকে ট্রাক থেকে বালির পাজা

বেলচা মেরে মেরে ফুটপাথে ফেলার কাজে কেউ ডাকবে না। সে করে দিতে চাইলেও ডাকবে না। কুলির অভাবে ট্রাকটাকে দাঁড়িয়ে ও কাজের অভাবে বিশুকে বসে থাকতে হলেও ডাকবে না। অর্থাৎ বিশু লোকের মনে এমন একটা আত্মসচেতন, আত্মসম্মানের ভাব ছাপিয়ে দিতে পেরেছে তাতে সব কাজে কেউ বিশুকে ডাকতে পারে না। সব কাজ বিশুর যোগ্য নয়। একোবরে নিচুতলার মেঠো শ্রমিকের কাজে তাকে ডাকতে সংকোচ বোধ করে লোকে। তাই কোনদিন হয়তো সুকুমার বাবু বলে যা ত বিশু এটা কাদাপাড়ায় ডেলিভারি দিয়ে আয়। অথবা, ইলেকট্রিকের ব্যবসাদার অবনীদা বা তার কাজের ছেলেগুলো হয়তো বলে দেয়—এই বিশু, বোস না পেছনে একটু, ধরবি। বিশু ভাবে যে সমস্ত কাজে সে ডাক পায় সেই কাজগুলো সে নিজেই করা শুরু করতে পারে। কিন্তু কোন কারণে হয়তো তার করা হয়ে ওঠেনি। বা সুযোগ পায়নি। একদিন আশাদের চায়ের দোকানের উল্টোদিকে নিউ পোদ্দার ডেকরেটরের মালিক পোদ্দারদা তাকে কাজে নেয়। নেতাজি ইণ্ডোরের কাজ। পোদ্দারের কাজের ছেলে ভোলা আসে নি। সেই পদে বিশুকে বহাল করা হচ্ছে আজ। বিশুর চেতনায় জেগে ওঠে কাজটাতে সে নূতন, প্যাণ্ডেলের কাজে অদক্ষ। কীভাবে বুজবে। পোদ্দার তাকে সব বুঝিয়ে দেয়। এদিকে ভোলা উপস্থিত হবার আশঙ্কাও দেখা দেয়। তাড়াতাড়ি কাজটা বুঝিয়ে নিয়ে চলে গেলেও ভোলার কর্মহীনতার হেতু যে সে নিজে, সেটাও অন্তরে দোল খায়। আবার ভাবে পরবর্তীকালে না হয় ভোলার অ্যাসিস্টান্ট হিসেবে কাজ করবে। অন্তত মানসিক অপরাধ বোধটা তার থাকবে না।

এইভাবে বিশু চরিত্রের অন্তরুন্মিলন ঘটিয়েছেন লেখক উক্ত গল্পটিতে।

নারী-পুরুষ মনস্তত্ত্বের টানাপোড়েনের এক জটিল ছবি রয়েছে গল্পসমগ্রের প্রথম খণ্ডের ‘আহ্নিক গতি ও মাঝখানের দরজা’ গল্পে।

দুই ভাইয়ের সংসার। শিশির অবিবাহিত যুবা পুরুষ। তার দাদা আজ দশ বৎসর যাবৎ শয্যাগত, তার একদিক প্যারালিসিসে অসার। বৌদি তটিনী যথাসম্ভব সেবা যত্ন করে। ছয় ছেলেমেয়ের বড় সংসারে, দাদার অসুস্থতায় সমস্ত ভার এসে পড়ে শিশিরের উপর। একদিকে এতগুলো প্রাণীর অন্ন সংস্থান সহ পড়াশুনার খরচ, অন্যদিকে অসুস্থ দাদার ওষুধপত্র ইত্যাদির জন্য শিশিরকে অধিক পরিশ্রম করতে হয়। অফিসের কাজকর্ম

সেরে বাড়তি রোজগারের ধান্দায় সে দুই-একটা টিউশনিও জোগাড় করে নিয়েছে। তাই সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে পরিশ্রম করতে হয়। বাড়ি ফিরলে তাই বউদি তটিনীর কর্মের চঞ্চলতা বেড়ে যায় ঠাকুরপো শিশিরকে ঘিরে। তার সমস্ত প্রয়োজন, চাওয়ার আগেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যায়। এই পর্যন্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে একটা ভাগ্য বিড়ম্বিত পরিবারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফলে কোন রকমে টেনে নিয়ে যাওয়া একটা সংসারের কাহিনি।

কিন্তু শিশির এবং তটিনী মনের গহীনে প্রবেশ করে লেখক তুলে এনেছেন মানব মনস্তত্বের এক জটিল যন্ত্রণাময় আন্তঃস্রোত যা বাইরের পরিবেশে প্রকাশিত নয়।

তটিনীর স্বামী অর্থাৎ শিশিরের দাদা পঙ্গু, শয্যাশয়ী। সংসার চলছে তটিনী আর শিশিরের যৌথ কর্মোদ্যমে। তটিনী আর শিশিরের বয়সের ফারাক তেমন নেই। তটিনী যুবতী, শিশির তরতাজা যুবক। সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর তটিনীর আপ্যায়ন পর্যন্ত সমস্ত কাজ তাদের নির্ভেজাল বাহ্যিক সম্পর্ককে সমর্থন করে। কিন্তু মনের গহীনে একটা তীব্র আকর্ষণ তৈরি হয়ে যায় শিশিরের অন্তরে। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলে পাশাপাশি দুটো ঘরের মাঝখানের দরজাটা যার একদিকে তটিনীও তার স্বামীসহ সন্তানেরা, অন্যদিকে শিশির। সেই দরজা, দরজা বন্ধ করার শব্দ, দরজার কাঠামোর আলোছায়ার খেলার দিকে শিশিরের কান শোনার জন্য তটস্থ থাকে। সেই আলো আঁকা দরজার দুদিকের চৌকাঠ ধরে থাকে তটিনী। এই চিত্রের অন্তরালে আসলে তটিনীর শিশিরের প্রতি দুবাহু তুলে সাদর আমন্ত্রণের ইঙ্গিত রয়েছে। সারাদিনের যতটুকু সময় তারা পরস্পর পরস্পরের সাহচর্য পাওয়ার তা পেয়ে থাকে নিবিড় ভাবে। শুধু রাতটা তাদের বিচ্ছিন্ন করে তোলে। সেই রাতের দরজা বন্ধ করার উৎকট আওয়াজটা মনে হয় তাদের মিলনের বাধাদানের নানান উপকরণের যোগান দিয়ে ঠেকিয়ে রাখে। দরজার এই ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ তটিনী তেল দিয়ে বন্ধ করে দিতে চায়—'তটিনী ভাবে কাল তেল দিতে হবে।' অর্থাৎ তটিনী হয়তো তাদের মিলনের বাঁধাগুলোকে সরিয়ে দিতে চায়।

ভেতরে ফল্গুধারার মতো তাদের এই যে তৃষাতুর আকাঙক্ষা, বিভিন্ন কথাবার্তাও আচরণের আড়ালে ফুটে উঠেছে। শিশিরের দাদার বিছানাটা বড় নোংরা, রবিবারের সকালে

দাদার কাছে বসে চা খেতে খেতে সে বুঝতে পারে। তটিনী শিশিরের বিছানা, তার সমস্ত চাহিদা চাওয়ার আগেই নিখুঁতভাবে এগিয়ে দেয়, অথচ তার দাদার বেলায় এমনটা হচ্ছে না। ধরে নেওয়া অস্বাভাবিক নয় যে তটিনী ধীরে ধীরে কেন্দ্রিভূত হচ্ছে শিশিরের দিকে। শিশিরের কখনো মনে হয় তার দাদা বৌদিকে ডাকছে, তার কাছে বসে থাকা বৌদিকে সে কথা জানালে, বৌদিকে দাদার প্রয়োজনে পাঠাতে চাইলে বৌদি অর্থাৎ তটিনীর উত্তর—'বাদ দাও ওসব কথা।' তাহলে তটিনী যে ধীরে ধীরে আপন স্বামীকে ধরেই বেঁচে থাকতে চাইছে না, অবহেলা, করছে। স্বামীর মৃত্যুর আশঙ্কা তুচ্ছ করে দূরে রাখছে কার টানে? একদিন শিশিরকে তটিনী জানায় যে লোকটা দুধ দেয়, তাকে দুধ দিতে বারণ করতে। দুধ না দেওয়ার ফলে অপুষ্টি বা শরীর ভেঙ্গে যাওয়া আশাঙক্ষা। বিশেষত অসুস্থ দাদার। শিশিরের প্রশ্নের উত্তরে তটিনী জানায়—''তোমার দাদার জন্য তো দু'জনেই ডুবতে পারি না।''[৯] মনে খটকা লাগে, তটিনী তাহলে ভেতরে ভেতরে চাইছিল শিশিরের দাদা মরুক, স্বামীসহ তটিনী 'দুজন' আর নয়, শিশিরের সাথেই সে এখন 'দুজন'। শিশির গৃহের উপার্জনকারী পুরুষ, আর গৃহকর্ত্রী তটিনী।

রবিবারের অবসরে ছেলেমেয়েদের পড়া দেখছিল শিশির। খোকন কাকার কাছে পড়া একটু বুঝে নেওয়ার জন্য যখন প্রশ্ন করে—'জনক' আর 'পিতার' অর্থ এক হওয়ার পরেও তাদের পার্থক্য করতে বলা হয়েছে। সেই পার্থক্য কী? উত্তরে শিশির 'জনক মানে জন্মদাতা, আর—' বাকিটা অর্থাৎ পিতা মানে যে পালন করে, সে কথাটুকু না বলে পাশেই বসে থাকা তটিনীর দিকে তাকায়। অর্থাৎ শিশির তাদের পালন করছে। সেই সন্তানের জন্মদাতা তার দাদা কিন্তু তাদের সমস্ত রকম ভরণপোষণ করে চলেছে শিশির। অর্থাৎ শিশিরের 'পিতা' শব্দের অর্থ না বলা এবং তটিনীর দিকে চাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের অন্তরের মিলনটুকুকে চকিতে চিনে নেওয়া যায়। অবোধ সন্তানরা কিছু বুঝল না অথচ চোখের চাহনীতে নির্বাক দুটি মানুষ তাদের অন্তরে বুঝে নিল সব।

রবিবারের সকালটাতেই শিশির তার দাদার সাথে দেখা করার ভালোমন্দ বলার সুযোগ পায়। দাদা কোন কথা না বলে শিশিরের হাতটা নিয়ে আলতো করে বোলাতে থাকে। দাদার এই স্নেহ কি শুধুই স্নেহ? তার পঙ্গুত্বের কারণে সংসারের হাল ধরা শিশিরকে

কি কখনো ছেড়ে না যাওয়ার করুণ আকুতি নয়! তটিনী সারাদিন স্বামীর ঘর ছেড়ে বাড়ির নানান কাজে ব্যস্ত থাকে। প্রয়োজনে অবশ্যই স্বামীর কাছে যায়। কিন্তু রাতে যখন তটিনী গিয়ে স্বামীর পাশে শোয় তখন তটিনীকে সেই অসুস্থ শরীরে, কাঁপা কাঁপা হাতে টানতে থাকে। আদর করার বৃথা চেষ্টা করে। কিন্তু শারীরিকভাবে সে পঙ্গু। শারীরিক সম্পর্কে অপারক। তবুও তার এই চেষ্টা কেন? তটিনীর স্বামীর ভেতরে কি আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে তটিনী যুবতী, তার উদ্যাম শারীরিক চাহিদা রয়েছে অথচ তার কাছ থেকে শারীরিক চাহিদাটুকু মিটছে না বা ভালোবাসার ক্ষমতা নেই। ছোট ভাই, ভর যুবক শিশিরকে নিয়ে তার কী আশাঙক্ষা দেখা দেয় নি যে অখনো অবিবাহিত।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যের এই গোপন কথাও তটিনী শিশিরকে জানায়। গোপন এইসব কথার মধ্য দিয়ে হয়তো তটিনী শিশিরকে তাতিয়ে দিতে চেয়েছে। সমস্ত বিবেকের বাঁধাগুলো ছিঁড়ে ফেলে সে যাতে তটিনীর কাছে সশরীরে চলে আসতে পারে।

তৃষাতুর মন অথচ অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতার আড়ালে শিশির এবং তটিনী দুটি চরিত্রের জটিল আবর্তে গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। হাতের কাছে জল, অথচ পান করার প্রতিবন্ধকায় তৃষাতুর দুটি চরিত্র যন্ত্রণার অন্তর্জাল থেকে কোনদিন বেরতে পারেনি। নিয়তির মতো কঠোর সেই প্রতিবন্ধকতা দূর হবে সেদিন, যেদিন—''তাদের দু'জনের দেহ শীতল হবে, হিম হবে, পঞ্চভূতে মিশে যাবে।''[১০]

দেবেশ রায়ের গল্প সংকলন তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'অনৈতিহাসিক' গল্পেও পুরুষ মনস্তত্বের গভীরে ঢুকে লেখক বের করে তুলে ধরেছেন এক হত দরিদ্র নদী নির্ভর ভূমিহীন এক মানুষের অন্তর্বেদনা, হতাশা এবং জীবনযুদ্ধ।

গল্পটিতে প্রধান চরিত্র ভাসিন্দির। বানার মুখে তার জন্ম হয়েছিল বলে তার নামকরণ এরকম হয়েছে। তার বসত বাড়ি এখন তিস্তার ধূ ধূ চরে। এক সময় তার পৈতৃক বাড়ি ছিল। যেখানে তার জন্ম হয়েছিল। বানায় সব শেষ হওয়ার পরে অর্থহীন ভাসিন্দির তিস্তার চরে আত্মীয়হীন, পড়শিহীন জীবন যাপন করছে। যে চর বালুকাময়, যে চর জলের নিকট সম্পর্কিত হওয়ার পরও রসহীন সেই চরে আবাদ কৃষি হওয়া সম্ভব নয়। ভাসিন্দির তাই জীবন-জীবিকার জন্য তিস্তার উপর নির্ভরশীল। এ যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'

উপন্যাসের পদ্মা-তীরবর্তী মাঝিদের কথা কিংবা অদ্বৈত মল্ল বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের মালোদের কথা মনে করিয়ে দেয়। যাদের জীবন নদীর গতির সাথে সমান্তরাল। ভাসিন্দির তিস্তায় ভেসে আসা কাঠ ধরে জীবন চালায়। তার স্ত্রী এবং দুই বছরের সন্তান রয়েছে। এর আগে একটা কন্যা মারা গেছে। না খেতে পেয়ে তার সেই সন্তান যখন নিস্তেজ, রাতের অন্ধকারে চলে আসে ভাসিন্দির তিস্তার ভয়াল জলে কাঠ ধরার জন্য। হয়তো বা সংসারের গণগণে খিদের রাজ্য থেকে পালিয়ে এসে বিস্তৃত তিস্তায় বুক ভাসিয়ে সমস্ত কিছু ভুলতে চায় বলেই তার মাঝ রাতে আসা, অমোঘ বৃষ্টিতে নিরন্তর ভেজা। দু'দিন হল বাচ্চাটা খায়নি। আর তারও বেশি সময় ধরে ভাসিন্দির নিরন্ন। পারহীন দিগন্ত বিস্তৃত তিস্তায় বুক ভাসিয়ে সে যেন ভুলতে চায় তার শুধু শরীরটা ছাড়া যে আর কিছু নেই। কিন্তু দূরে থাকা গাছ, ইলেকট্রিকের খুঁটি এই সমস্ত পার্থিব বস্তু তাকে আবার স্মরণ করিয়ে দেয় তার কিছু না থাকার কথা, তার দারিদ্রের, নিরন্নের কথা।

মধ্যরাত থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভিজে, জলে সাঁতার দিয়ে ক্ষুধার্ত ভাসিন্দির যখন অবসন্ন। আলো ফুটলে পারের চড়ে সমস্ত কাঠ জড়ো করে মেলে দেয় শুকাবার জন্য। নিজেও শরীরটাকে শুকাবার জন্য গা মোছে একমাত্র আণ্ডারওয়ারটি খুলে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ শরীরটাকে মেলে ধরে নিসীম চরে। ভাষা যেন পৃথিবী বিচ্ছিন্ন এক জীব। পরক্ষণে তার সেই ভ্রম ভাঙে। তখন এই নীল আকাশ, রোদ, শহরের অয়্যারলেসের থামের মাথা, ইলেকট্রিকের থামের মাথা, শহরের বড়-বড় গাছের মাথা দেখে ভাষা যেন নিজের ঠিকানা খুঁজে পায়। খুঁজে পায় তার মনের গহীনে গেঁথে রাখা স্বপ্ন। আপন সন্তানের হাস্য মুখ। স্ত্রীর স্নেহ ভালোবাসার ওম তাকে শান্তি দিত। পুরুষার্থ মিলতে পারত সেই স্বপ্নের। কিন্তু ভাসিন্দির জীবনের আরও এক মূল্য অভাবের তাড়নায় বেঁচে দিতে বাধ্য হয়েছে। ভাসিন্দির অপারেশন করে নিজেকে নির্বিজ করে দিয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সরকার জন্ম নিয়ন্ত্রণে সাড়া দিলে তাকে পনের টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করেছে। ভাসিন্দির গত ভাদ্র মাসে জন্ম নিয়ন্ত্রণে নেয়। ঐ পনের টাকার আশায়, নিজের, স্ত্রীর এবং দুধের বাচ্চাটির ক্ষুধার আগুন নেভাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। আবার কার্তিক মাসে ঐ একই কারণে স্ত্রীর অপারেশন করিয়েছে। তিস্তার চরে উন্মুক্ত পুরুষাঙ্গের এই নির্বিজতা অপ্রয়োজনীয়তা অন্তরের পৌরুষদীপ্ত

মনকে একের পর এক আঘাত হানতে থাকে। উন্মাদ হয়ে যায় ভাসিন্দির উচ্ছিষ্ট হয়ে যাওয়া নিজের শরীর দেখে। পাগলের মত ছুটতে থাকে ভাসিন্দির, অথচ সেই ছুটতে থাকা বাইরের কোন অভিঘাতে নয়। অন্তরের দহন তীব্র থেকে তীব্রতর হলে তখন মানুষ উপায়হীন অথচ যন্ত্রণীাপ্ত সেই ক্ষতকে ভুলে থাকার জন্য নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। জনমানবহীন সেই তিস্তার চরে ভাসিন্দিরও তাই করেছিল। আপন পঙ্গুত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল।

ভোরের আলো ফুটলে দূর থেকে জলে ভেসে আসা একটা কাঠের দিকে চোখ নির্দিষ্ট করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিস্তার জলে। সে দেখে সেই একই কাঠটিকে ধরতে চাইছে আরও একজন। শুরু হয়ে যায় অনির্দেশ্য প্রতিযোগিতা। শেষ পর্যন্ত ভাসিন্দির কাঠটি ধরে। ভেসে আসা অন্য লোকটিও সেই কাঠের অপর প্রান্ত ধরে নিজের করায়ত্ত করতে বদ্ধ পরিকর। শুরু হয়ে যায় দু'জনের মধ্যে রেষারেষি। কে আগে ধরেছে তার প্রমাণ দিতে মরিয়া। কিন্তু ভাসিন্দির জানায় ভাসিন্দিরের কী নিজের এক্তিয়ার বলে কিছু নেই, সে যেহেতু এইখানে বসত করে আছে, এই ঘাটে কাঠ ধরে, তাই সে এলাকাটুকু তারই। সেই লোকটির এইখানে এসে কাঠ ধরতে চাওয়া ঠিক হয়নি। ভাসিন্দির আপেক্ষের সুরে জানায়—'শালা, ভাসা ঝ্যান নদীর পাড়, যার ইচ্ছা আসি হাগি যাবে?' অর্থাৎ ভাসিন্দিরেরও যে একটা নিজস্ব পরিচয় থাকা উচিৎ, তারও যে কিছু এক্তিয়ারে থাকা সম্ভব এটা স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের। তারপর জলের ভেতরে সেই কাঠ নিজের আয়ত্তে ধরে রাখার লড়াইয়ে ভাসিন্দির আর সেই ভেসে আসা, কাঠ ধরতে চাওয়া মানুষটি যেন একাত্ম হয়ে যায়। ভাসা যখন তার দারিদ্রের কথা, সহায় সম্বলহীনতার কথা ক্ষোভের সুরে জানায়—'শালা, সগার বাবার নদী কাঠ জমিন ধান আর ভাষার বাবার শুধু দেহখান?' একথা শোনার পরে সেই মানুষটি উত্তর দেয়—'হামার ত শুধু দেহখান আর অ্যালায় এই নদীখান, কাঠ ছাড়ি দেও ভাই।' এইখানে এসে ভাসিন্দির আর সেই মানুষটির দ্বন্দ্ব যেন তিস্তার জলে জল হয়ে যায়, যাদের আর কোন পার্থক্য থাকল না। তারা একি যাত্রার, জীবনযুদ্ধের পথিক, তখন দু'জনের হাত কাঠটি নিজের দিকে টানার বদলে যেন সমান্তরালভাবে ধরে আছে—একে অপরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য নয়। ভূমিহীন, গৃহহীন লোকটার সঙ্গে ভাষা আত্মীয়তাবোধ করে

ফেলেছিল। কিন্তু ভাসিন্দির যখন জানতে পারে সেই লোকটির স্ত্রীর কথা, তাদের সন্তানের কথা, তার স্ত্রীর গর্ভবতীর কথা, ভাবী সন্তানের কথা তখন ভাসিন্দিরের অন্তরে জান্তব চেহারাটা আবার প্রকাশ্যে আসে। সে, হেচকা টানে লোকটিকে ছিটকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। কাঠ তার নিজের অধিকারে আসে। ভাসিন্দির তার আপন জীবনের নির্বিজতা, এই পৌরুষহীনতা প্রতিটা মুহূর্ত ভুলে থাকতে চায়। যে জীবন আর জীবন সৃষ্টিতে অক্ষম, বাপ হওয়ার রসদ পনের টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে সেই জীবনকে যেন চোখে আঙুল দিয়ে তাচ্ছিল্য করল একটু আগে সেই কাঠ ধরা মানুষটির আপন স্ত্রীর গর্ভবতীর সংবাদ দিয়ে। দারিদ্রে তারা সমার্থক, তারও কিছু নেই এই শরীরটা ছাড়া। কিন্তু ভাসিন্দিরের মত নির্বিজ শরীর তার নয়। এখান থেকেই ভাসিন্দির জান্তব আকার ধারণ করে। আদতে ভাসিন্দির নিজের এই অবস্থাকে অস্বীকার করতে চায় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায় পৃথিবীর কাছ থেকে। তার বাড়ি যেমন ধ্বংস হয়ে এখন তিস্তার ছারে এসে ঠেকেছে। তেমনি জীবনও যেন সজীব জীবন থেকে বীজদীপ্ত পৌরুষে পরিপূর্ণ জীবন থেকে 'ছার'এ এসে পৌঁছেছে। সে আজ বঁজা, তার বৌ বাঁজা। তারা সৃষ্টিতে অক্ষম এক পঙ্গু, 'ছার'।

খ. রাজনৈতিক বাতাবরণ মূলক ছোটগল্প :

দেবেশ রায়ের জন্ম ১৯৩৬ সালে। আমাদের দেশ স্বাধীন হয় ১৯৪৭। অর্থাৎ দেবেশ রায় তখন ১০-১১ বছরের বালক। রাজনীতির, দেশভাগের উত্তাল তরঙ্গ তার বোঝার ক্ষমতা তখনো হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মিডল ইংলিস বা হাই ইংলিস স্কুলের কোন কিশোর যখন রাজনীতির সাথে যুক্ত হয় তখন আমাদের মনে সন্দেহ হয় সত্যিই দেশভাগ, তৎকালীন দেশ স্বাধীন পরবর্তী, উত্তাল রাজনীতি তার রক্তে চমক এনে দেয়নি এটা হতে পারে! ছাত্রাবস্থাতেই সমবয়সী কিশোর বন্ধুদের থেকে এই রাজনৈতিক চেতনার কারণেই দেবেশ রায় কেমন যেন আলাদা হয়ে যায়—একথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন তাঁর ছোটগল্প সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায়। কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী দেবেশ রায় একজন প্রভাব বিস্তারী নেতা হয়ে ওঠেন যৌবনে। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া, পুলিশি ধরপাকর ইত্যাদির কারণে তাঁর জীবনও ছিল উথাল-পাতাল, পরবর্তীকালে ১৯৫০ সালে

কমিউনিস্ট পার্টি আইনি ঘোষিত হয়। বাড়তে থাকে গোটা পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের সংখ্যা। দেবেশ রায়ের দৈনন্দিন জীবনও আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে যায় রাজনীতির গন্ধে। তাছাড়াও রাজ্যে বর্গাদার আইন, কৃষকদের স্বার্থে প্রচলিত প্রবর্তিত আইনের ফাঁকফোকরে সাধারণ ভূমিহীন কৃষকের যথাপূর্বং অবস্থা, রাজনীতির, ধর্মীয় গোড়ামির জাতাকলে উদ্বাস্তু মানুষের ঢল দেবেশ রায়ের চোখের সামনে দিয়ে বয়ে গেছে। রাজনীতির, রাষ্ট্রনীতির, সাথে জড়িয়ে থাকা এই মানুষটির লেখনীতে তার ছায়া পড়বেই এটাই স্বাভাবিক। সাহিত্য ব্যক্তি মানুষের চেতনে অবচেতনে নিজেকেই যেন গড়ে তোলে। আপন চিন্তা চেতনা, অভিজ্ঞতা যা সে পেয়েছে চোখে দেখা মানবসমাজ, প্রকৃতি, এবং মনুষ্য সৃষ্ট কার্যাবলী থেকে তাকেই সাহিত্যে জীবন্ত করে তোলেন লেখক। আগাগোরা একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী দেবেশ রায়ের বহু গল্পে তাই রাজনীতির ছোঁয়া খুঁজে পাওয়া যায়। দেবেশ রায়ের অনেক গল্পে রাজনীতি কখনো নিজেই চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে বা চরিত্রের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আবার কখনো রাজনীতি একটা আরহ তৈরি করে দিয়ে চরিত্রগুলিকে ছেড়ে দিয়েছে। রাজনীতির এই আবহ এবং ইঙ্গিত রয়েছে 'ক্ষয় ও তার প্রতিকার' গল্পটিতে।

'ক্ষয় ও তার প্রতিকার' গল্পটি চরম বিন্দু মিলে গেছে রাজনৈতিক স্রোতের মাঝখানে। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে আলোকে নিয়ে মূলত গল্পটির সূচনা। সে স্যানাটোরিয়াম থেকে ফিরেছে। যক্ষ্মার মত মারণ রোগ তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে ধরাতে তাকে দূরবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেখানে ছাত্রাবাসের মত থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় নিয়ম মাফিক চিকিৎসা এবং চিকিংসার বন্দোবস্তের কারণে। যক্ষ্মা রোগির কাছে থাকলে তার ছোঁয়া খাবার খেলে যে-কারও যক্ষ্মা হতে পারে সে ভয়টাও তার পরিবার অস্বীকার করে না; তাই তার স্যানাটোরিয়ামে থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। কিছুদিন পর আলো যখন বাড়ি ফেরে ভাই তপনের হাত ধরে—সেখান থেকেই গল্পের শুরু। আলো যখন বহুদিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থেকে আপন বাড়িতে ফিরে বুঝে নিতে চাইছে তার পুরনো সেই পরিচিত পরিবেশ সে সব বুঝে ওঠার সাথে সাথে তার মনকে আকড়ে ধরে থাকে তার মারণব্যাধি, তার যত্রতত্র যাতায়াতের অঘোষিত নিষেধ। স্বাভাবিক জীবন থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মুহূর্তে সে আবার গুটিয়ে যায়। এরই মাঝে ভাই তপন, যে তরুণ, সিনেমা পাগল তার আবদারে তাকে সায়

দিতে হয়। বাড়িতে যেখানে ছোওয়া ছুয়ির একটা দূরত্ব বজায় রাখা হয়। সেখানে তপন আলোকে রুটি তৈরি করতে বলে একদল সংগ্রামী কৃষকের ক্ষুধাতুর জ্বালা নিবারণের জন্য। তপন জানায় কোন এক স্থানে কৃষকেরা চাষবাস করে তাদের জীবন অতিবাহিত করছিল। কিন্তু সেখানকার জোতদার সেই সমস্ত কৃষকরে জমি ছিনিয়ে নেয়। আর তারই বিরুদ্ধে তিন চার'শ কৃষক সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। এখানে বলে রাখার, মাক্সীয় তত্ত্বে 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' একটা বিশাল অংশ জুড়ে আছে। যুগে যুগে এই অসম দ্বন্দ্ব চলে আসছে। এই গল্পেও দেখা যাচ্ছে কৃষকের দ্বন্দ্ব জোতদারের সাথে। দিকে দিকে ভূমিহীন কৃষকেরা জোতদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। তপন এই সমস্ত প্রলেপতারিয়েত সংগ্রামী মেহনতি মানুষের শরিক হয়ে তাদের সাহায্য করতে উদ্‌গ্রীব। আর তাই আলোকে অনুরোধ করে ঐ সমস্ত মানুষকে ক্ষুধার যৎসামান্য অন্ন যোগাতে। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য, যে আলোকে সংসার ছোঁয়াছুয়ির বাইরে রেখে দেয় প্রাণের ভয়ে, আশু মারণ রোগের ভয়ে, সেখানে শ্রমিক কৃষক দরদী, কর্মী তপন বিনা দ্বিধায় আলোর বানানো রুটি দিতে স্বীকৃত হয়। আসলে জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের এগিয়ে চলার বার্তাই গল্পের শেষাংশে রয়েছে। যেখানে শেষ পরিণতি জেনেও এগিয়ে চলার মন্ত্র জাগরুক থাকে প্রতিটি সংগ্রামী মানুষের ।

দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডের একটি গল্প 'উদ্বাস্তু'। এই গল্পে থিতু হওয়া, শান্ত, নিরুত্তাপ সংসারে রাষ্ট্রীয় নীতি কেমন করে পরিবারটিকে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, তথা নিজেরই প্রতি অবিশ্বাস তৈরি করে দিয়েছে, তারই গল্প। 'উদ্বাস্তু' গল্পের সূচনাতেই গল্পকার মধ্যবিত্ত জীবনের চাওয়া-পাওয়া এবং না-পাওয়ার দীর্ঘশ্বাসকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে অল্পেতে আপাত খুশি এক টিকে থাকা জীবনের সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। যেখানে জীবনের মূল্যের থেকে তার ঘর গোছানোর মূল্যাঙ্ক অনেক বেশি। 'জীবিকার জন্য জীবন' এই পরিবর্ত অন্তরমানসিকতা ক্ষয়িষ্ণু জীবনের, প্রকৃত অর্থ থেকে ছিন্নমূল জীবনের ছবি একটি ক্ষুদ্র পংক্তির ভেতরে বলে দিয়েছেন লেখক।

গল্পের এই পটভূমিকার পরেই লেখক সত্যব্রতের সুখী, অটুট বন্ধন, স্ত্রী-কন্যা সমেত এক ছোট্ট গৃহকোণের ছবি তুলে ধরেছেন। তার পরেই ঘটে ইন্দ্রপতন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

গোটা পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশ কোন না কোনভাবে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের ভয়াবহ লীলা একদিকে যেমন বহু প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি অসংখ্য মানুষকে তার মূল থেকে উপরে ফেলে দিয়েছিল এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। গোটা পৃথিবী জুড়ে এই উৎখাত মানুষের সুশৃঙ্খল জীবনে যে এলোমেলো ঝড় এসেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির অনেক পরে প্রত্যেকটি দেশ নিজেদের ঘর গুছিয়ে নেওয়ার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই ঝড় স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত স্থিতি লাভ করে। শুধু তাই নয়; খণ্ডিত স্বাধীনতা একদিকে বহু মানুষের স্বাভাবিক ছন্দকে যেমন বিপর্যস্ত করে অন্যদিকে তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা উৎখাত মানুষের ঢলকে জিইয়ে রাখে বহুকাল। পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলমান দ্বারা অত্যাচারিত নিপীড়িত, উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত বয়ে চলে ভারতবর্ষের পানে।

এরকমই একটি পূর্ব প্রেক্ষাপটে সত্যব্রতের কাছে দু'জন লোক এসে জানিয়ে যায় তাকে নিকটবর্তী থানায় গিয়ে তাকে প্রমাণ করে আসতে হবে সত্যব্রত যে সত্যব্রত। রাষ্ট্রসংঘ থেকে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়েছে—

> ''১৯৩৯ থেকে ৪৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর ভূগোল ও ইতিহাসে যে গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে, তার একটি সুসম্পাদিত ও সুসংগৃহীত তালিকা না থাকায়, পৃথিবীর অধিবাসীদের দেশ, জাতি ভাষা, বংশ ইত্যাদি চিহ্নিত করার কিছু ব্যাঘাত ঘটেছে। ... সে কারণে 'খাটি ব্যক্তির সন্ধান' নামক রাষ্ট্রসংঘের কর্মসূচীর ভিত্তিতে আমরা সমস্ত দেশেই যে-যা বলে পরিচিত, সে-তা কিনা, তা পরীক্ষা করছি।''[১১]

থানার এই অনুসন্ধান তারই অঙ্গ।

বল্লভপুর থানায় যাবার পর সত্যব্রতের জীবন ওলোটপালোট হয়ে যায়। রাষ্ট্রের যুক্তিজাল এমনভাবে পক্ষবিস্তার করে যে, তার নিজের প্রতি কোন এক মুহূর্তে যেন সন্দেহ তৈরি হওয়ার জন্য যথেষ্ট। দেশভাগ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ইত্যাদির একটা বেসামাল অবস্থায় সত্যব্রতের মতো অনেকে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। অনেক তথ্য ও অনুসন্ধানের যুক্তিজালে শেষ পর্যন্ত তিনজন সত্যব্রতের পরিচয় বেরিয়ে আসে। এবং এও বেরিয়ে আসে যে সত্যব্রত

আসলে কোন এক মৃত সত্যব্রতের পরিচয় আত্মসাৎ করে বেঁচে আছে। আবার সত্যব্রত যে বাড়িটাতে রয়েছে, যেটা তার নিজের নামে সরকারী খাতায় নথিভুক্ত এবং বিগত কয়েকবছর ধরে তার খাজনা মিউনিসিপ্যালকে দিয়ে আসছেন সেটা আদতে তার নয়। কারণ মৃত মনসুর আলি সেই বাড়ির প্রকৃত মালিক ছিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর সপরিবারে মনসুর আলি শ্রীবনবিহারী নামক ব্যক্তির উপর সেই বাড়ির ভার অর্পণ করে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। সেই বছরেই বনবিহারী সেই বাড়ি সত্যব্রতের কাছে বিক্রি করেন। অর্থাৎ বনবিহারী সেই বাড়ির প্রকৃত মালিক ছিলেন না অতএব তাঁর বিক্রিত বাড়ি সত্যব্রতের বাড়ি হতে পারে না। সত্যব্রত রাষ্ট্রের এই যুক্তি জালের মাঝে পড়ে গৃহ থেকে মানসিকভাবে উদ্বাস্তু হয়ে গেলেন। ষোলকলা পূর্ণ হয় যখন তার স্ত্রীর পরিচয় রাষ্ট্রের অনুসন্ধান এবং যুক্তিজালে জড়িয়ে পড়ে। সত্যব্রতের স্ত্রী অণিমা যে অণিমা তার প্রমাণ দিতে হবে। বিশ্বব্যাপী 'খাটি ব্যক্তির অনুসন্ধান' কর্মসূচীতে অণিমার অনুসন্ধান করতে গিয়ে রাষ্ট্রের কাছে অণিমাও সন্দেহাতীত নয়। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় অণিমার বাবা শ্রীহেমচন্দ্র সান্যাল জনাব এনামুল হক চৌধুরীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এনামুল হক আপন ক্ষমতায় তাদের রক্ষা করে। এনামুল হকের সঙ্গে অণিমা 'কুমকুম' নাম ধারণ করে বিবাহ করে। বিবাহের রেজিষ্ট্রেশন-এ কুমকুমের পিতার নাম দেওয়া আছে। এইচ.সি সান্যাল। এই এইচ. সি সান্যাল কি আসলে সত্যব্রতের স্ত্রী অণিমার পিতা হেমচন্দ্র সান্যাল দেখা দেয় সন্দেহ। রাষ্ট্রের আরো বহু যুক্তিজালে সত্যব্রতের স্ত্রী অণিমার এমন পরিচয়ের প্রকাশ পায় যা একজন মানুষকে হতোদ্যম করার জন্য যথেষ্ট। শুধু তাই নয়, অণিমা সত্যব্রতের একামাত্র কন্যা অঞ্জুর পরিচয়ও পক্ষান্তরে এক বিরাট সন্দেহের আবর্তে প্রবেশ করে।

গল্পকার মাত্র দু-তিনটি চরিত্রের স্বল্প ঘটনা প্রবাহে যুদ্ধ দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে একেবারে মাটি, পরিবার-সমস্ত কিছু থেকে উৎখাত করে একটা নিরালম্ব সাগরে নিক্ষেপ করে।

৬০ এর দশক কমিউনিস্টদের বাড়বাড়ন্তের কাল। মানুষের চোখে পুরাতন কায়েমি শাসনকে উপরে ফেলে এক নতুন দিগন্তের প্রতীক্ষায় এগিয়ে চলেছে বাংলার কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ। ১৯৫৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টি আইনসিদ্ধ হওয়াতে পরবর্তীকালে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং উন্মাদনা গোটা বাংলাকে নতুন স্বপ্ন দেখাতে থাকে।

আপাদমস্তক কমিউনিস্ট দেবেশ রায়ের চোখে সেই স্বপ্ন নানা রূপে অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল। তারই কল্পময় রূপ পেয়েছে 'মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট' নামক ছোটগল্পে।

অতীতে বার্ণেশ ঘাটকে বার্ণেশ জংশনও বলা হত। 'মালবাজার থেকে বার্ণেশ পর্যন্ত একটা রেলপথ এসে কুচবিহার জেলার দিকে চলে গিয়েছিল, সেই কারণে জংশন। আর তিস্তা পার হয়ে ওপারে সদর জলপাইগুড়িতে যেতে হত, সেই কারণে ঘাট।' এখন আর বার্ণেশ-এ ট্রেন আসেন না। বার্ণেশ মৃত জংশন। কিন্তু জনসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক যোগাযোগের কারণে বার্ণেশ আজও মুখরিত। ধূপগুড়ি, লাটাগুড়ি, চ্যাংরাবান্ধা, মেখলিগঞ্জ, মায় আলিপুরদুয়ারের পর্যন্ত মানুষ বার্ণেশ ঘাটে আসে তিস্তা পেরিয়ে জেলা শহর জলপাইগুড়িতে পৌঁছোবার জন্য। প্রচুর বাস আসত যাত্রীদের নিয়ে বার্ণেশ ঘাট পর্যন্ত।

বার্ণেশ ঘাট হয়ে তিস্তা পার হওয়ার জন্য দুটো সরকারী ফেরীর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু একটু বৃষ্টি, বন্যা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপদ দেখা দিলেই ফেরী দুটিতে লাল নিশান ঝোলানো হত। অর্থাৎ ফেরী বন্ধ। কিন্তু বৃষ্টি বা কোনকিছুই তো মানুষের প্রয়োজনকে অত সহজে আটকাতে পারে না। তাই ফেরীতে অল্পেতেই লাল নিশান উড়লেও সেই বিপজ্জনক নদীপথে পাড়ি দেবার ভার গ্রহণ করে অনেক বেসবকারী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নৌকা। এই কোলাহলমুখর বার্ণেশ ঘাটকে কেন্দ্র করে ভাদুই নামক রাজবংশী ছেলের জীবন সংগ্রাম পল্লবিত হয়ে ওঠে।

দশ এগারো বছরের ছেলে ভাদুই তিন-চার বছর আগে এই বার্ণেশ ঘাটে তার কাকার দোকানে কাজ করতে এসেছিল। কাকার দোকান উঠে গেলে ভাদুই আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। তারপর এ-দোকানে ও-দোকানেকাজ করে সে নিজের বেঁচে থাকার রসদ যোগায়। কোন দোকানের ফাঁকা জায়গায় রাত্রিবাস করে। ফেরী বন্ধ হলে তার জীবন সংগ্রাম আরও মুখরিত হয়ে ওঠে। ভাদুই সে সময় কোন না কোন নৌকার হয়ে যাত্রী ধরার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এটা তার উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম। আর এই যাত্রী ধরার কাজ করতে গিয়ে অন্য নৌকার মালিক বা কর্মচারীর সাথে বেধে যায় প্রতিযোগিতা, সংগ্রাম। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার লেখক এখানে ভাদুইকে শ্রমিক হিসেবে তুলে ধরেছেন। মার্ক্সীয় তত্ত্বে শ্রেণিদ্বন্দ্বের আলোচনায় শ্রমিক মালিকের যে দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে তার অনুষঙ্গ এখানে বিদ্যমান।

যাত্রী ধরতে গিয়ে অন্য নৌকার মালিক আবুনের সাথে বেঁধে যায় ভাদুইয়ের দ্বন্দ্ব। বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে সেই দ্বন্দ্ব হয়তো হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছবে। কিন্তু তা কখনো হয় না। আসলে জীবন সংগ্রামের গতিধারা বার্ণেশ ঘাটে সবার প্রায় এক। তাই প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার প্রয়াস সবার। কিশোর ভাদুই সেই বয়সেই জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ। যাত্রী নৌকায় তুলে দেওয়ার পরে তার কাজ শেষ। নীরব ঘাটে ভাদুই থেকে যায়। তার দু'চোখে স্বপ্ন দেখে কোন একসময় দেখা জীবন্ত শিলিগুড়ির জংশনে রেলগাড়ি, আলো।

আসলে পোক্ত রাজনৈতিক কর্মী দেবেশ রায় ছিন্নমূল কিশোর শ্রমিক ভাদুইয়ের চোখ দিয়ে হয়তো দেখতে চেয়েছেন আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে; কমিউনিস্ট আদর্শে গড়া বাংলা তথা ভারতবর্ষকে। যেখানে লড়াই সংগ্রাম দ্বন্দ্বে জাতাকলে সাম্রাজ্যবাদী, বুর্জোয়া সমাজের ধ্বংসের পর আসবে এক শ্রেণিহীন, শোষণহীন শ্রমিক শ্রেণির শাসন। তাই কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের প্রতীক লাল ঝাণ্ডা বারবার বিভিন্ন অনুষঙ্গে এসেছে।

অনিষ্টকারী শাসন শুধু যে হাতে মারে তা নয়। নানান নিয়ম, আইন কানুনের বৈধ সিল মোহর প্রয়োগ করে অগণিত সাধারণ মানুষকে শুষে নেয়। যার প্রত্যক্ষ দায় এড়ানো অনেক সহজ এবং সোজা। 'দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার' গল্পটি তারই সাক্ষ্য বহনকারী। 'দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার' গল্পে আকালু নামক গ্রামের এক চাষীর ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হওয়া এবং এই মৃত্যুর নানাবিধ কারণের বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে রাজনীতির এক গভীর আবর্ত তৈরি হয়েছে।

আকালু উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার মণ্ডলঘাট নামক একটি গ্রামের অধিবাসী। সে বিঘে দশেক জমি চাষ করে, জোতদারবাবুর, এই অঞ্চলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাকে বসবাসের জমি, ঘর ও চাষের লাঙল-বলদ বিছন সবই দিয়াছেন। গত প্রায় বিশ সাল ধরে এইরূপই চলে আসছে।' আকালুর বিষয়ে গল্পের প্রথম দিকে লেখকের এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে আন্দাজ করে নেওয়া যায় উত্তর বাংলায় আকালুর মত চাষারা প্রচলিত ভূমি নিয়মে ধাতস্ত এবং এতে তাদের কোন দুঃখ কষ্ট তেমন ছিল না। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি, যুদ্ধ, স্বাধীনতা পরবর্তী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনকেও আন্দোলিত করে তোলে। দীর্ঘদিন ধরে চলা ভূমি ব্যবস্থা পঞ্চাশের দশকে এসে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে

এগিয়ে চলে। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে 'লাঙল যার জমি তার' এই আইন লাগু হওয়াতে চাষী এবং জোতদারের সম্পর্কে চির ধরে। ঘনিয়ে আসে অবিশ্বাস, সন্দেহ। আকালুর ক্ষেত্রেও তার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এই পরিস্থিতি নিরক্ষর আকালুর কাছ থেকে কোন যাতে ক্ষতির সাধন না হয়, জোতদার সে বন্দোবস্ত করে নেয় তার কাছ থেকে যথেচ্ছ টিপসহি নেওয়ার মধ্য দিয়ে। ইতিমধ্যে দাঙ্গা যুদ্ধ ইত্যাদির ফলে সমাজজীবনে নেমে আসা দুর্যোগ দুর্ভোগে আকালু জোতদারের প্রাপ্য ধান খেয়ে ফেলেছে। ক্রোধান্বিত জোতদার তাকে জমি থেকে তুলে দেবার হুমকি দিয়েছে। জলপাইগুড়ি শহর থেকে ফেরার পথে আকালুর মনে ভূমি থেকে উৎঘাত হওয়ার ভয়, সাংসারিক অনটন-সবমিলিয়ে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। উপরন্তু পকেটে তেমন পয়সা ছিল না। রাস্তায় খাওয়ার জন্য যে পয়সাটুকু তার কাছে আছে সেটা ছাড়া বাড়তি টাকা তার কাছে ছিল না। তাই সে হাঁটা পথে রওনা দেয় মণ্ডল ঘাটের উদ্দেশ্যে।

তাই বিপর্যস্ত আকালু শহর থেকে প্রথমে হাঁটা পথেই রওনা দেয় বাড়ির উদ্দেশ্যে। শহরের শেষ প্রান্তে এসে তার মনে হল পথঘরচার জন্য যতটুকু টাকা তার কাছে আছে সেটা দিয়ে যদি সে রেলে যায়, তাহলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারবে আর বাড়ি ফিরলেই তার ক্ষুধার কোন সমস্যা থাকবে না। তাই সে ফিরে রেলে করে বাড়ি ফিরতে গিয়ে চলন্ত রেলে ওঠার চেষ্টা করে প্ল্যাটফর্মে থাকা 'চা'-এর বড় বড় বাক্সে ধাক্কা খেয়ে রেলের চাকায় টুকরো টুকরো হয়ে যায়। মৃত্যু ঘটে আকালুর।

আসলে প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তনে যেমন আকালুর ভূমি সমস্যা এবং জোতদারের গালমন্দ জুটেছে কপালে, ঠিক তেমনি মনে হয়, আকালুর মন খারাপের দিনে, পকেটে পয়সা না থাকার দিনে আকালুর যা করতেন বাড়ি ফেরার জন্য সেই নিয়মকে লঙ্ঘন করে হয়তো তার জীবনের সমাপ্তি ডেকে এনেছেন।

আকালুর এই দুর্ঘটনা অনেক প্রশ্ন এবং রাজনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। রাষ্ট্র নেতাদের ইন্ধনে বেজে উঠেছিল হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, যে দাঙ্গার কথা বারবার ফিরে এসেছে গল্পকারো লেখনিতে। বাংলার ভূমিসংস্কার আইন, প্রজাস্বত্ব আইন ওলোট-পালোট করে দিয়েছিল কৃষকদের জীবন, সাথে সাথে নিয়ে এসেছিল

সংঘাত। শুধু তাই নয়, লেখক নানান বর্ণনার মধ্যদিয়ে ধনতন্ত্রের শোষক শাসক শ্রেণির দিকে বারবার অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। যে ধনতন্ত্রের জাতাকলে হাজার হাজার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবন তিলে তিলে ধ্বংসের পথে। প্ল্যাটফর্মে রাখা চায়ের বাক্স যে বাক্সে হোচট খেয়ে আকালুর জীবন শেষ হয়ে গেল, সেই বাক্স যেন ধনতন্ত্রের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাধারণভাবে ভাবা যেতে পারে আকালু চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে ঠিক করে নি। কিন্তু তার পরই প্রশ্ন হয় তিনি কেন সময় নষ্ট করে প্রথমে হাঁটা শুরু করলেন, কেন তার মন ভালো ছিল না, তার এরকম অভাবের মূল কোথায়? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই চলে আসে রাজনীতি এবং রাজনীতি প্রসূত কানুন।

'বটা সান্যালের অন্তর্দ্বন্দ্ব' গল্পটিও রাজনীতির আবহে গড়া। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে ভারতের শাসন ব্যবস্থার টালমাটাল অবস্থা, ১৯৬২ তে চীন-ভারত যুদ্ধ। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসী শাসন, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের বিস্তার, রাজনৈতিক পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র, সমস্ত কিছুই এই গল্পের ভেতরকে গড়ে তুলেছে।

বটা সান্যাল চা-বাগানের মালিক সহ নানান চা-বাগানে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবসা রয়েছে। ব্যাঙ্কের থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে অনেক চা কোম্পানীর মত তারও চা-বাগান চলে। কিন্তু ৬২'এর চীন ভারত যুদ্ধে ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন দেশীয় বাগানের মালিকগুলিকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তাতে বিপদে পড়ে বটা সান্যালের মত বাগান মালিকরা। গোলমাল দেখা দিতে পারে বাগানের শ্রমিকদের ভেতরে টাকা না দিলে। অন্যদিকে বিদেশী সাহেবদের চা কোম্পানী দিব্যি চলে যাচ্ছে ব্যাঙ্কের দেওয়া অর্থে। ওখানকার চা শ্রমিক ইউনিয়নও আদতে কোম্পানীর অঙ্গুলি হেলনে চলে। চীন ভারত যুদ্ধে ভারত সরকার সমস্ত বড় বড় যানবাহনগুলো নিয়ে নেয়। এরকম একটা রাজনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক আবহে বটা সান্যাল বিব্রত। উপেন নাপিতের মুখ দিয়ে লেখক জানিয়েছেন তৎকালীন কংগ্রেসে ভাঙনের কথা। দেশরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেননকে কংগ্রেস থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট মতাদর্শে শ্রদ্ধা রাখার জন্য। উপেন নাপিতও বিগত নির্বাচনের সময় কমিউনিস্ট ছিল। কিন্তু উপেন আদতে কংগ্রেস মতাদর্শে বিশ্বাসী। রাজনীতির গভীর ষড়যন্ত্রে ক্রম উত্থিত কমিউনিস্ট আন্দোলন, তার প্রসার সমস্ত কিছুর খবরাখবর হয়তো নিতে চেয়েছিল কংগ্রেস তাদের

নিজেদের কাউকে কমিউনিস্ট ডেরায় ভিরিয়ে দিয়ে। তখন কমিউনিস্ট পন্থী মানুষদের পাপী বলে গণ্য করা হত। উপেন নাপিতের কথায় তার প্রমাণ মেলে—''আর যদি জেলেই যাই তবে পাপী-তাপী কমিউনিস্ট চোর ডাকাতগণকে ইষ্টনাম শোনাতে পারব; দেখবেন, ওখানেও আমি অষ্টপ্রহর করব—।''[১২] যুদ্ধের বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ঊর্দ্ধগামী, অন্যদিকে চীন ভারত যুদ্ধে ভারতবর্ষের মানুষ দুইভাগে বিভক্ত ছিল—বিশেষত কমিউনিস্টদের মধ্যে। উল্লেখ্য '৬২ এর এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টি দু'ভাগ হয়ে যায়। এই যুদ্ধের মত গুরুতর বিষয়ে চা-বাগান অধ্যুষিত মানুষগুলোকে নিয়ে হবে এক জনসভা। যার প্রচার চলছে, নারায়ণ বাবু এসেছেন বটা সান্যালকে সেই সভার কনভেনার হতে। এখানেও এক কঠিন রাজনীতি। এই সভায় কংগ্রেস সামনের সারিতে না থেকে পেছন থেকে তা পরিচালিত করবে, সাধারণ মানুষ বুঝতে না পেরে সেই সভায় আসবে। আর জনসাধারণের মনোভাবের আঁচ বুঝে নেওয়া, সাথে তাদের মনকে স্থানান্তরিত করারও প্রচেষ্টা করা সম্ভব হবে। এই কারণে প্রচ্ছন্ন কংগ্রেসী সহ রাজনীতির প্রায় বাইরের গণ্ডীতে থাকা বটা সান্যালকে ঐ সভায় ভেরানোর তাগিদ। বটা সান্যাল একটা সময় নেতা গোছের কিছু একটা হওয়ার চেষ্টাও করেছিল কিন্তু সফল হননি। আজ তাকে এতবড় একটা পদে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার সন্দেহ দেখা দেয় মনের ভেতরে। এই মিটিং-এ থাকলেও ভালো আবার না থাকলেও ভালো। থাকলে ভালো এই কারণে যে, প্রস্তাবটা এসেছে সেখানকার প্রভাবশালী গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকে, মিটিং-এ না থাকলে তারা চটে যাবে। আর সেই সমস্ত প্রভাবশালী লোকগুলোর কুদৃষ্টিতে পড়লে বটা সান্যালের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ থাকবে না সে কথা জানা। আবার মিটিং-এ গেলে যুদ্ধের মত গোলমালগুলো থামলে ধরে ধরে সরকারের শাস্তি দেওয়ার মত বিপদও থাকতে পারে। আবার এই মিটিং-এর আর একজন অন্যতম সভ্য ভোলাবাবু; অন্যদিকে নিমাইবাবু অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং কোম্পানীর মালিক। নিমাইবাবু আর ভোলাবাবুর বাগান বাদে সব বাগানে ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে। ইংরেজ সাহেবরা হঠাৎ করে তাদের চা কোম্পানী বিক্রি বন্ধ করে দিল কোন এক অনির্দেশ্য ইঙ্গিতে। গভীর ষড়যন্ত্রটি বটা সান্যালের বুঝতে বাকি থাকে না যে, টাকার অভাবে বটা সান্যাল চা শ্রমিকদের আন্দোলনে বিপর্যস্ত হবে, অর্থাভাবে বিক্রি করতে বাধ্য হবে

সেই বাগানকে। প্রভাব প্রতিপত্তিশালী নিমাইবাবু এবং মিটিং মিছিলের সহযোগী হয়ে বটার কাছে ঘেসতে চাওয়া ভোলাবাবু সেই বাগান আত্মসাৎ করতে এগিয়ে আসবে।

গল্পটিতে আদ্যোপান্ত রাষ্ট্রিক অস্থিরতা, রাজনীতি সমাজনীতির সংকট এবং ষড়যন্ত্রে গল্পটিকে এক অন্যমাত্রা দান করেছে। লেখকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গী ছিল রাজনীতি। তাই তার লেখনীতে রাজনীতির অন্তঃস্রোতে থাকা রাজনীতি নির্ভর নানা জীবনাভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটবে এটাই স্বাভাবিক।

রাজনীতির ঘনঘটায় গড়া আর একটি ছোটগল্প 'অমলেন্দু, মালতী ও আরো কয়েক প্রকারের ভালোবাসা'। রাজনীতির আবর্তে, মালতি, অমলেন্দুর প্রেম আর লক্ষ্মী বৌদির সংসার নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বয়ে চলে। গল্পের পটভূমিকার কাল চীন ভারত যুদ্ধ, ব্ল্যাক আউটের কাল। চীন প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের একাংশ সহানুভূতিশীল ছিল। সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রমিক শ্রেণি, প্রলেতারিয়েত শ্রেণি যখন জাগরুক হচ্ছে, চীনও তার একটা বড় অংশীদার। অবশ্য ভারতীয় কমিউনিস্টরা সে সময় ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত চীন প্রসঙ্গে দু'ভাগ হয়ে যায়। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহী আখ্যা দেয়। অমলেন্দু সেরকমই একজন কমিউনিস্ট, শাসকের দেওয়া দেশদ্রোহী তকমাখ্যাত মানুষ। অমলেন্দু কমিউনিস্ট, নির্ভীক, আপন দৃঢ়তায় অটল। কংগ্রেস সরকারের পেশীশক্তিবহুল ক্যাডাররা তাকে মারার জন্য ওৎ পেতে থাকে। অমলেন্দু সাবধান হয় না। নিজের প্রয়োজনে যত্রতত্র যে কোন সময় উপস্থিত হয় এমনকি মালতীদের পাড়াতেও। যে পাড়ার এক যুবক সে একাধারে কংগ্রেসী দেশ প্রেমিক অন্যদিকে মালতী পিপাসু। যুদ্ধের বাজারে চারিদিকে শুধু বিশ্ব রাজনীতি, যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক নানান প্রসঙ্গে মুখর প্রচার মাধ্যম। অন্যদিকে ভারতীয় কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে জেলে যাওয়ার জন্য মানসিক ভাবে তৈরি। শান্তি দা যেমন করে অনিবার্য জেল জীবনের জন্য তৈরি হয়ে আছে। শেষবারের মত নিজের সন্তানকে আদর করছে। অমলেন্দুও তাই। তাকে ধরার জন্য পুলিশের আগমনের জন্যই সে যেন অপেক্ষা করতে থাকে।

মালতীর ভেতরেও অমলের জন্য বুকভরা ভালোবাসা রয়েছে যা প্রকাশিতব্য নয়। মুহূমুর্হু অপেক্ষা করে অমলেন্দুর কোন বিপদের আশঙ্কায়। অমলেন্দুর খবর নিতে গিয়ে

লক্ষ্মী বৌদির কাছে শুনতে পায় আর এক গৃহিনী, আর এক প্রিয়ার জীবনের গল্প যার স্বামীর জীবন রাজনীতির স্রোতে ভেসে গেছে বহুকাল। স্বামীর কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্মী বৌদি বলে যায় বিয়াল্লিশের আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, এবং শেষ পর্যন্ত সেই সবেতে সম্পৃক্ত, উদ্দীপিত স্বামীর কথা, স্বামীর দেশদ্রোহী তকমার কথা।

অর্থাৎ সমস্ত গল্পটি জুড়েই অন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনা, রাজনীতির আবহে গল্পটির চরিত্রগুলো স্থাপিত। তাদের প্রেম ভালোবাসা, সংসার—সমস্ত কিছু রাজনীতির পরিহাসে পরিবর্তমান।

১৯৬৮ সাল। বাংলায় চলছে রাষ্ট্রপতির শাসন। রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রশাসনিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক বৈকল্য, অব্যবস্থা, পশ্চিম বাংলাকে সেই দিকে ঠেলে দেয়। এই অস্থির সময়ে বসে দেবেশ রায় লিখেছেন 'রাষ্ট্রপতি শাসনে' গল্পটি। গল্পের নাম এবং তৎকালীন পশ্চিম বাংলার শাসন একীভূত। ছোট্ট একটা ঘটনাকে রাজনীতি, আইন কানুনের মাঝে রেখে গল্পকার তীব্র বিরোধীতা করেছেন নানা ইঙ্গিতে তৎকালীন সেই শাসন এবং আইনের বেড়াজালকে। বিপন্ন, উদ্বাস্তু মানুষগুলোকে চোখের সামনে যন্ত্রণাকাতর দেখেছিলেন ডুয়ার্স, চা-বাগানের পথে প্রান্তরে।

গল্পটি সাদামাটা দুটো পাশাপাশি বসবাস করা পরিবার এবং তাদের লোকজনের বর্ণনা দিয়ে শুরু। বিশেষ করে নিবারণের বর্ণনাটা তুলনায় ব্যাপক। কারণ প্রথমত সে জীবনবিমা করায়, অনেকটা স্বচ্ছল এবং নিজের মারণ ব্যাধি হার্টঅ্যাটাক নিয়ে সদা সচেতন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো, দেবেশ রায়ের সাথে তৎকালীন জলপাইগুড়ির বীমা কোম্পানীর অফিসের অনেক মানুষের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বীমা অফিসের অনেকে মার্ক্সবাদী ভাবনার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং দেবেশ রায়ের রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন। সে যা হোক, গল্পে নিবারণের পেশা বীমা করা। মানুষ বীমা কেন করে? যখন কোন বিষয়ে কোন কিছু ধ্বংসের আশঙ্কা থাকে। সে মানুষের জীবনই হোক, বাড়ি, গাড়ি, দোকান যাইহেকা না কেন। এবং এই বীমার ব্যবসা নিবারণের ক্রম-ঊর্ধ্বমুখি। লেখক ইঙ্গিতে মানুষের অনিশ্চিত, আশঙ্কাময় জীবনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন যা শাসক শ্রেণি ক্রমভ্রান্ত নীতির ফলে জাত।

প্রতিবেশি নিবারণবাবু এবং ডিরেকটরের বাড়ির মাঝে একটা উৎকট গন্ধ বেরিয়ে আসে। অনেক খানাতল্লাসীর পরও যখন সেই উৎকট পচা গন্ধের হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন নিবারণবাবু বাধ্য হয়ে জমাদারকে ডাকে। জমাদারের খোঁজে নিবারণবাবুর চোখে আবিষ্কৃত হয় নিবারণবাবুর স্যানিটারি ট্যাঙ্ক-এ একটা মৃত মানুষ। অনিবার্যক্রমে পুলিশ আসে। এরপরে পুলিশের খানাতল্লাসি, জিজ্ঞাসাবাদের আবহে মহামান্য বিচারপতির সামনে উঠে আসে নানা সূত্র। জানা যায় এই মৃতদেহ খেকমণির স্বামী। কিন্তু আইনের চোখে খেকমণি এবং তার স্বামী রামগোপাল বলে কেউ নেই। কারণ খেকমণি জানিয়েছে তার বাড়ি মাইঝ্যাল-এ। মাইঝ্যাল একটি নদীর চর। সেটা সরকারী সম্পত্তি। আইন অনুযায়ী লাইসেন্স না নিয়ে সেখানে কেউ বসত বাড়ি তৈরি করতে পারে না। সরকারের খাতায় সেই জমিটা ফাঁকা পড়ে আছে। সুতরাং মাইঝ্যালে কোন মানুষ থাকে না, খেকমণি এবং রামগোপাল বলে কোন মানুষ নেই এবং মাইঝ্যালের চরে বসবাসকারী সহস্র মানুষের নেই কোন অস্তিত্ব। বস্তুত জোতদারী ব্যবস্থার পরিবর্তন, প্রজাস্বত্ত্ব আইন, বর্গাদার প্রথা ইত্যাদির ফলে বহু কৃষক উদ্বাস্তু হয়েছিল অন্য বহু জায়গার মত উত্তরবঙ্গেও। আইনের ফাঁক গলে, লোক বলে সরকার স্থিরীকৃত কৃষক স্বার্থের আইন কার্যত কোন সুফল দিতে পারেনি মাটির সাথে মিশে থাকা মানুষদের। এই উৎখাত মানুষদের তাই আইনের, সংবিধানের নিয়মে অধিকারহীন, পরিচয়হীন। তারা সশরীরে থেকেও নেই।

রামগোপালকে হত্যা করেছে উপেন দাশ। অর্থবলে লোকবলে বলীয়ান উপেন মাইঝ্যালের চরে কৃষক দিয়ে চাষাবাদ করে চাষাদের বঞ্চিত করে ক্ষেতের ফসল নিজরে করায়ত্ত করে। রামগোপাল ছিল এই উপেন দাশের চাষী। ক্ষেতের ফসল ফললে রামগোপালকে সরিয়ে দিয়ে সেই ফসল তোলাতে যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য উপেন লোক দিয়ে রামগোপালকে কয়েকদিনের জন্য হাসপাতালে থাকার মত ঘায়েল করার বন্দোবস্ত করে। এই সময়ে তার ফসল ঘরে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু অতি আঘাতে রামগোপালের মৃত্যু হয় এবং তাকে নিবারণ বাবুর স্যানিটারি ট্যাঙ্কে লুকিয়ে গায়েব করে দেওয়া হয়। উপেন এও জানায় মাইঝ্যালের চরে সরকারী কানুন অনুসারে কোন মানুষ নেই। তাই কোন বিপদও হবার সম্ভাবনা নেই। শুধু তাই নয়, খোকমণির এক নকল স্বামী হাজির হয় বিচারালয়ে।

এই নকল স্বামী কার পরিকল্পনার ফসল তা জানতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক অস্তিরতায় সে সময় মানুষের বিশেষত খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ ছিল বিপন্ন। পরিচয়হীন গোত্রহীন এক অপাংক্তেও চরিত্র মাত্র। এই পরিচয়হীনতা, অধিকার হীনতা শুধু খেকমণি বা রামগোপালের বা মাইঝ্যালের চরের সেই বহু লোকের ছিল না। অনিশ্চিত জীবনের আশঙ্কা আক্রান্ত করে প্রত্যেকটি মানুষের অন্দরে। তাই গল্পের শেষে লেখক বিচারকের সামনে থাকা পুলিশের জবানীতে বলেছেন— নিবারণ বাবুর ট্যাঙ্কে মরা মানুষ, আমাদের প্রত্যেকের বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্কে থাকতে পারে, আমরা সবাই পরিচয়হীন। '' রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন পবিত্র ভারতীয় সংবিধানের অধীনে আমরা প্রত্যেকেই মৃতদেহ ও প্রত্যেকেই খুনী।''[১৩]

উত্তরবাংলার অধিবাসীরা বরাবরই শান্ত প্রকৃতির। এখানকার প্রকৃতি, ভূমির মোহময় পরিবেশ মানুষের প্রকৃতি ওভাবেই তৈরি করেছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার তথা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রান্ত ভূমির এই মানুষগুলোকেও আন্দোলিত করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রবেশে। মতাদর্শগত প্রভেদে ধীরে এখানকার একেবারে সহজ-সরল মানুষগুলোর ভেতরে ঢুকে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সচেতনতার পাশাপাশি তাদরে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে। পশ্চিম বাংলার এরকমই একটা উত্তাল রাজনৈতিক পরিবেশে 'জয় যাত্রায় যাও হে' গল্পটি প্রতিষ্ঠিত।

'জয় যাত্রায় যাও হে' গল্পটি রচনাকাল ১৯৭০ সাল। বাংলার রাজনীতিতে সে সময় সি.পি.আই. (এম) ও বাংলা কংগ্রেস-এর কোয়ালিশন সরকার চলছে। নাম দেওয়া হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। কোয়ালিশন সরকার থাকলে মত পার্থক্যগত মর্যাদাগত এবং উন্নয়নগত ইত্যাদি নানাবিধ কারণে একটা টালমাটাল অবস্থা এবং চাপ সবসময় থাকে। সে সময় পশ্চিম বাংলার সরকারের ক্ষেত্রেও এই পরিণতি ক্রিয়াশীল ছিল। শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টে সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করেন। এতদিন সি.পি.আই. (এম) এবং বাংলা কংগ্রেসের যে মিল মিছিল ছিল এই পদত্যাগে তা গভীর শত্রুতাতে পরিণত হয়। আবার উত্তরবাংলায় উদ্বাস্তু মানুষের ভীরে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা গভীর নাড়া খায়। তার ফলে ভেতরে ভেতরে উদ্বাস্তু মানুষ এবং এখানকার ভূমি পুত্রদের মধ্যে

তীব্র অসন্তোষ জমতে থাকে। এরই আবহে এই গল্পটির কাঠামো তৈরি করেছেন লেখক।

গল্পে দুইটি মাত্র চরিত্র। আকালুদ্দিন এবং নারাণ মল্লিক। কাজের তাগিদে বাড়ি ফেরার পথে রাত হয়ে যাওয়ায় আকালুদ্দিন চির পরিচিত রাস্তায় বাড়ি ফিরতে পারে না। কারণ যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাওয়ার কারণে নারাণ মল্লিক আর আকালুদ্দিন আজ চরম শত্রু। ঘুর পথে, বন্যার ফলে পলিমাটি পড়া এদো মাঠ দিয়ে, নদীর পতিত ধার দিয়ে জ্যোৎস্না রাতে আকালু যখন নারাণ মল্লিকের পাড়া এড়িয়ে চলচে প্রাণহানির আশঙ্কায় তখন সেই একই পথে উল্টো দিক থেকে আসা একই প্রাণহানির আশঙ্কায় বিদ্ধ নারাণের সাথে দেখা হয়ে যায় আকালুদ্দিনের। রাজনীতির ক্ষেত্রে দু'জনেই পরিচিত মুখ, শুধু তাই নয় তাদের গলার স্বরও বহু মানুষের পরিচিত। রাতের আবছা চাঁদের আলোয় দু'জনের লুকোচুরির মত খেলা শেষে যখন তারা পরস্পরকে চিনে ফেলে তখন প্রথমে তাদের শুরু হয় প্রাণ নেওয়ার হুমকি পরস্পরের প্রতি। তারপর পরস্পর পরস্পরের সন্দেহের মাঝেই একটা আত্মরক্ষার মত দূরত্বে থেকে তাদের কথা শুরু হয়। এই সময় আমাদের মনে পড়ে সমরেশ বসুর সেই 'আদাব' গল্পটিকে। যাইহোক, তাদের কথাবার্তায় উঠে আসে রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্যের কথা, রাজনৈতিক মতপার্থক্য হেতু অজয় মুখার্জীর পদত্যাগের কথা। এরই মাঝে তাদের কথায় আবার পারদ চরতে থাকে হিন্দু-মুসলমান বিভাজনমূলক উক্তির মধ্য দিয়ে। নারায়ণের এই বিভাজনের কথা তোলার কারণ হয়তো পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার স্মৃতি তার মনে এবং জীবনে আমুল পরিবর্তন করে দিয়েছিল বলে। হয়তো সে কারণেই সে উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছিল উত্তরবাংলায়। হয়তো কেন, নারাণের উক্তিতে পাওয়া যায়—"...তুই হালা মুসলমান। হালা আমিও চাষার পোলা। হালা এহানে বস্যা খুব লিডারি কইরব্যার ধরস। আর পাকিস্তানে আমাদের থাকার উপায় নাই।"[১৪] অন্যদিকে উদ্বাস্তু মানুষের ভীরে উত্তরবাংলার অর্থনৈতিক জনজীবনে যে একটা কুপ্রভাব পড়েছে তারই অন্তর্ক্ষোভ আকালুদ্দিনের কণ্ঠে শুনতে পাওয়া যায়—"নারাণ, সাবধান, শালা ঢাকাইয়া, ভাটিয়ার ঘর, হামার দেশি ভাইগুলার উপর যমদূতের তানে আসি পড়ি গেইল, শালা নারাণ ভাটিয়া, চলি যা আমার মাটিঠে, চলি যা—।"[১৫] অথচ এই দু'জন দু'জনের কখনো কোনকালেও শত্রু ছিল না। তা হলে আকুলুদ্দিন কেন বলবে— তলাটায় তর মতন ভালো

মানষি থাকিবা পারে। রাজনীতির জটিল ষড়যন্ত্র, মতাদর্শ এই মানুষ দুটোকে তথা এরকমই সাধারণ মানুষগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে চিরকাল ধরে। রাজনীতির বিষ তাদের পরস্পরকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে যেখানে পরস্পর পরস্পরের সমব্যাথী, অন্তরে এক হওয়া সত্ত্বেও তারা আজ একসাথে হাটতে পর্যন্ত পারে না। নারাণের কথায়—''তুই আর আমি একসাথে যাব্যার দিন শ্যাষ রে, তুই আর আমার কমরেড না। তুই মুসলমান, আমি হিন্দু। তুই দেশি আমি ভাটিয়া।''[১৬]

রাজনীতির জটিল আবর্তে আকুলুদ্দিন এবং নারাণ আজ পরস্পর পরস্পরের শত্রু, বড় অজানা, পরিচয়হীন। রাজনীতির মোড়কে তাদের জীবন ঘিরে মোড়া। বিচ্ছিন্ন করে তাদের ক্রমশ দূরে ঠেলে দিচ্ছে। শেষে গল্পকার মানব জীবনের এই বিচ্ছিন্নতা, শত্রুতাকে ভুলে এক নতুন পথের সন্ধানের স্বপ্ন শুনিয়েছেন। রাষ্ট্রিক, ব্যক্তিক এবং সামাজিক জীবন নানা সময় নানারকম উত্তাল ঢেউয়ে বিক্ষুব্ধ হবে, লণ্ডভণ্ড হবে, তারই ভেতর থেকে সঠিক পথ বেচে নিয়ে, খুঁজে নিয়ে সমস্ত ঝড়-ঝাপটাকে প্রতিহত করতে হবে—'' দেশ গাঁ জন্মভূমি যদি ঘন্টায়-ঘন্টায় নতুন-নতুন বানায় ডোবে, আর ডাঙায় ভাসে, কেনং করি ঘাটা-আঘাটা চিনিবার পাম?' খুঁজিবার নাগিবে, খুঁজিবার নাগিবে—।''[১৭]

এই আশ্বাস বাণী দিয়েই গল্পটির সমাপ্তি টেনে দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় দেবেশ রায় তার চোখের সম্মুখে দেখেছিলেন বহু রাজনৈতিক টানাপোড়েন, পঞ্চাশের দশকের ধর্মীয় সন্ত্রাস, তৎকালীন শাসকের রক্তচক্ষু। যার চক্রে পড়ে বহু মানুষ ছিন্নমূল হয়ে নারকীয় অনাচার, যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। বিশেষত সেই মানুষগুলির বেদনা সহচর হয়েই তার এই ধরণের গল্পগুলো ডানা মেলেছে। অন্যদিকে শরীর এবং অন্তরাত্মায় একজন কমিউনিস্ট কর্মী হওয়াতে তাঁর প্রত্যেকটি মুর্হূত কেটে গেছিল রাজনৈতিক, আদর্শ, চেতনা, তাকে রক্ষা করার বিস্তার করার অদম্য সাহস এবং পরিশ্রমে। যে আদর্শ, স্বপ্ন সঞ্চারী রূপে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে গেছিল সেইদিন। সেই স্বপ্নের এবং ঘটে যাওয়া দুঃস্বপ্নের চিত্র তার এই বিভাগের গল্পগুলিতে নানা রূপে রূপায়িত হয়েছে।

গ. সমাজ চেতনামূলক ছোটগল্প :

কথাসাহিত্যেকে সমাজ প্রতিফলনের আতুরঘর বললে অত্যুক্তি হয় না। সমাজের নানান ঘাত-প্রতিঘাত, মানবিক চেতনা, প্রকৃতি প্রতিবেশ জীবন্তরূপে প্রতিভাসের ক্ষমতা রাখে। দেবেশ রায়ের বিভিন্ন ছোটগল্পে সামাজিক চেতনা ভিন্নতর মাত্রায় অঙ্কিত হয়েছে তাঁর সংকলিত গল্প গ্রন্থে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানান পত্র পত্রিকার বুকে। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে 'অন্তঃসার' পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'ক্ষুরধার নগর' গল্পটিতে একটি ক্ষৌরকার পরিবারের কাহিনি গ্রন্থনে আগ্রাসী ধনতন্ত্রের প্রকোপে ব্যক্তিসত্ত্বাধীন মানুষ ধীরে ধীরে কীভাবে পরাজয় স্বীকার করে তার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

মানুষে মানুষে সামাজিক ভেদ, মানুষের নিজে হাতে তৈরি। বলা ভালো সুবিধাবাদী শ্রেণির সুবিধা ধরে রাখার এক অমোঘ কৌশল। সেই কৌশলের সাথে অদৃষ্ট ঈশ্বরের সংযোগ ঘটিয়ে তাতে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে যা মানুষ যুগ যুগ ধরে মেনে আসছে। এমনি নিয়মে ক্ষৌরকাররা বংশ পরম্পরায় ক্ষৌর কার্য করে আসছে। পৈর্তৃক সম্পত্তির মত সেই পেশাটাও তাদের সম্পত্তি। উত্তম পুরুষে লেখা এই গল্পে বক্তার পিতাও তাই করে আসছে, অনিবার্যভাবে তাকেও সেই কাজটিই করে যেতে হবে। রক্তের ভেতরে থাকা এই অনিবার্য টান হয়তো তাকে পড়াশুনায় উন্মনা করে তোলে, সে বারবার অকৃতকার্য হতে হতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে সহপাঠীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে মা তার বাবাকে বারবার বলতে থাকে বাড়িটা প্রোমোটারকে দিয়ে দিতে। কারণ প্রোমোটারের দেওয়া লোভ কথকের মায়ের চোখে অন্য স্বপ্ন দেখায়। বাড়িটা প্রোমোটারকে দিলে মুহূর্তে তিনতলা চারতলা হয়ে যাবে। একটা পুরো তলা তাদের দেওয়া হবে। কিন্তু কিছুতেই কথকের পিতা সে কথায় কান দেন না। অনিবার্যভাবে মায়ের দিক থেকে ভেসে আসে 'আসলে নিচু জাতের লোক তো, লোভ করায় সাহস নেই। মা হয়তো সামাজিক ক্ষেত্রে উঁচু জাতের, তাই তার কাছ থেকে বিভিন্ন সময় এই বিভাগের নীতিগুলিকে ঝালিয়ে নিতে হয় আপন পদমর্যাদার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

কথকের বাবার পৈর্তৃক সূত্রে পাওয়া ভিটে বাড়িটার মত পেশাটাও আজও আছে এবং চলছে। রাস্তার ধারে সেলুনের দোকান। যা কাজ কর্ম চলে তাতে পরিবারকে উচ্চ শখ

না দেখালেও একটা নিম্ন বিত্তের পরিবারকে স্বচ্ছল বলার মত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু রাস্তাটা রাস্তার তাগিদে বেড়ে উঠতে থাকলে দোকানটি ভেঙে দেওয়া হয়। কথকের পিতা কথা বলতে বেশি পারেন না তাই কিছু বলেনও নি। দোকান নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করে এসে পড়ল বড় রাস্তার ধারে। রাস্তা বড় হলে বাড়তে থাকল গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা। দিনে দিনে সেখানে প্রোমোটারদের লোভ মুহূর্মুহূ পড়তে থাকায় রাস্তার ধারের সমস্ত জমি অন্যের হাতে চলে যায়। গজিয়ে ওঠে বিলাসের রকমারি ব্যবস্থা। অনিবার্যভাবে কথকের পিতার বর্তমান দোকানের জায়গা সমেত স্থানটি চলে যায় ধনাঢ্য কোন লোক বা সংস্থার হাতে। কথকের বাবার নিরবতায় সেই লোকেরাও খুশি হল। এটাই তো চাওয়া হয় ছোট লোকদের কাছ থেকে না হলে বড়লোকের অপ্রতিরোধ্য বিজয় রথ আটকে যাবে। কথকের পিতা যেন সেই মূক লাঞ্ছিত সমাজের প্রতিনিধি যাদের প্রতিবাদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কথকের বাবাকে সেই জমিতে ওঠা হোটেল 'পার্ল হার্বারে'র একটা কোনায় মাসিক বেতনে রাখা হয়। একটা মানুষ আপন স্বাধীনতায় যে বেঁচে ছিল, তার স্বাধীনতা কেড়ে নিল সেই 'পার্ল হার্বার' এবং তার বিশিষ্ট সত্তাকেও করে দেওয়া হল পরিবর্তীত।

অন্যদিকে গল্পের কথক নিজে যখন পড়াশুনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। বলা ভালো পেড়ে উঠছিল না, অনিবার্যভাবে পিতার পেশাটিই তার ভবিত্য লিখন। একটা সময় না একসময় তাকেও ক্ষুর কাচি সম্বল করে নিতেই হবে। অল্প বয়সের কারণে হয়তো এখনো হাতে খড়ি হয়নি, প্রয়োজন পড়েনি। এই সময়টাতে নামমাত্র পড়াশুনার আঁড়ালে সে নিজের শরীরটাকে পিটিয়ে একটা শক্ত খেলুড়ে লোকের আদল দিতে চাইল। অনেক পরিশ্রমে শরীর তৈরি হল নতুন আঙ্গিকে। সাতার, দৌড় তার নখদর্পণে। ব্যবসায়ী চোখ পড়ে গেল সেই শরীরটাতে। 'পার্ল হার্বার' তাকে 'শো' করার প্রস্তাব দিল। একটি ইণ্ডোর পুকুরে বানানো সমুদ্রের ঢেউয়ে 'লনলি ডলফিন' হতে হবে। সামনে থাকবে হোটেলে আগত খরিদ্দার। সেই 'শে' এ কথকের পিতা 'শো' করার আগ মুহূর্তে কথকের গলায় একটা ক্ষুর ঝুলিয়ে দেয়। জলের ভেতরে বাইরে কোন হিংস্র কিছু নেই, প্রতিযোগী নেই। তবুও সেটা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আসলে কথকের পিতা চোখের সামনে আত্মপরিচয়টাকে বিলীন হতে দেখে, পরম্পরাগত সম্পতিকে ধ্বংস হতে দেখে কথকের গলায় ক্ষুর ঝুলিয়ে সেটা আটকাতে চাইছেন, আত্মপরিচয় টুকু

বজায় রাখতে চাইছেন যে কোন উপায়ে।

একটা ক্ষৌরকার পরিবারের ঘটনার ভেতর দিয়ে লেখক মানুষের ছিন্নমূল অবস্থার চিত্র এঁকেছেন। যারা একসময় আপন ভূমিতে আপন স্বাধীন ব্যবসায় 'পিতৃ দত্ত পেশায়' পরিচিতিতে খুশি ছিল। আজ পরিবর্তিত সমাজ তাদের বিলীন করে দিয়ে নিয়ে গেল এক অনাহুত, বিক্ষিপ্ত পরিচয়ে, ছিন্নমূল হয়ে। গল্পের শেষ পংক্তিতে তাই লেখক জানালেন কথকের 'লনলি ডলফিন' প্রোগ্রামের শেষে—'সেই রাতে বাবা আর আমি পার্ল হার্বার থেকে একসঙ্গে আমাদের বংশগত জমি পেড়িয়ে বাড়িতে ঢুকলাম।' নূতন ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কড়াল গ্রাস থেকে ক্ষৌরকার পরিবার নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মননের নির্ভেজাল আত্মগত রূপ বিকিয়ে দিয়ে তারা ধনতন্ত্রের প্রয়োজনে বয়ে চলে।

সমাজচেতনার আর এক রূপ ফুটে উঠেছে লেখকের গল্পগ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের 'বৃষ্টিবদল' গল্পে। 'বৃষ্টিবদল' গল্পটির শুরুতেই—এত জোড়ে বৃষ্টি যে বাস থেকে নামাই সম্ভব না। আবার এর ঠিক পরের অনুচ্ছেদে তিনি লিখছেন— ''এমন আকাশ ভাঙা বৃষ্টিতে কলকাতা কেমন মুহূর্তে ঝলমল হয়ে ওঠে, বৃষ্টির মধ্যে।''[১৮] বৃষ্টি তার দুই ভিন্নরূপে দুই বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় কাহিরি প্রথম দুটি অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রথম অনুচ্ছেদের দুর্ভোগ আর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের নৈসর্গিকতা -এ যেন বাস্তবতাকেই তার দ্বৈত সত্তায় তুলে ধরা। বাসযাত্রী নির্মল ঘোষ, যার ভাবনা এবং অভিজ্ঞতার সংঘর্ষে এবং সমন্বয়ে কাহিনি আকার পায়, সে একই বৃষ্টির দুই চেহারা খুঁজে পায়। সাদা কালো ছবি বাতিল হওয়ার পর নির্মল ক্যামেরার জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে টি.ভি. সিরিয়ালের প্রোডাকশন ম্যানেজারির কাজে লেগে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু তবু সেই অতীত বারে বারে তাকে অসতর্ক মুহূর্তে আকড়ে ধরে। অবচেতনায় জেগে ওঠে তার পুরনো চোখ। কখনো মুখে বলে না, কিন্তু নিজেই চমকে চমকে আবিষ্কার করে সে চোখ দিয়ে দেখছিল না, ক্যামেরার পেছন থেকে দেখছিল। সচেতন হতেই সেই কাল্পনিক ক্যামেরা থেকে সে সরে আসে।

পরবর্তী দশটি অনুচ্ছেদ জুড়ে নির্মল সেই ক্যামেরায় ফিরে আসে। ক্যামেরা থেকে নির্বাসিত হয়ে তার কী লাভ ক্ষতি হল সে যুক্তি তর্কে ডুবে যায়। এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে সে পৌঁছে যায় চেতনায় অবস্থিত বন্ধু প্রসাদের ঘরে। দুই বন্ধুর মধ্যে প্রাথমিক কিছু অভিযোগ

অভিমানের কথা হয়। প্রমাদের অনুযোগ আজকাল নির্মল তার সাথে তেমন করে আর যোগাযোগ করে না। নির্মলকে বোঝাতে হয় বড় পর্দায় সঙ্গে টিভির ছোট পর্দার কত তফাৎ কাজে এবং চরিত্রে। আবার সেই প্রেক্ষিতের প্রশ্ন, প্রেক্ষিত নিয়ন্ত্রিত দ্বৈততার। এক সময়ে নির্মল কাজের কথায় আসে। গর্ভণমেন্টের একটা ক্যাম্পেনের অর্ডার পেয়েছে। বিষয় পরিবার কল্যাণ। তিন মিনিটের এই স্লটে প্রধান ক্যাম্পেন হবে মায়ের বুকের দুধের কোন বিকল্প নেই। এই একটি স্লোগানে কাহিনির কিংবা বাস্তবের দ্বৈত সত্তা যেন মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায়। গ্রামের বৃষ্টি এবং শহরের বৃষ্টি, ক্যামেরা এবং খোলা চোখে দেখা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে বাস্তবতার যে দুই ভিন্নরূপ লালিত হয়ে এসেছে কাহিনিতে তা হঠাৎ অদৃশ্য হয়। এক বিকল্পহীন বাস্তবতার ভেতর পাঠক প্রবেশ করেন মায়ের বুকের দুধের সামাজিক বাস্তবতার ভেতর দিয়ে। নির্মল প্রসাদকে বলে কয়েকজন মা জোগাড় করে দিতে, তাদের বা অন্যদের বাচ্চাসহ। মেক আপ ম্যান আর ড্রেসার তুলি আর পোশাকের রকমফেরে মায়েদের ভেতর সর্বভারতীয় চরিত্র এনে দেবে।

নির্মলের প্রয়োজনের তাগিদে এই সমস্ত সহজ সরল কথার ভেতর কিছু তাত্ত্বিক কথা তুলে ধরে। বস্তির মায়েদের শুকনো দুধ খাওয়ানোর বদলে মারুতি থেকে নেমে কোন সুন্দরী মেয়ে বাচ্চার মুখে দুধ দিলে দেখতে বেশি ভালো লাগবে কিনা, দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারটা ইঙ্গিতে আনা যায় কিনা, কৌটোর দুধের চেয়ে বুকের দুধ সত্যিই ভালো কিনা। এই সব অবাস্তব প্রশ্নে নির্মল কিছুটা বিরক্ত হয়। কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই প্রসাদ একেবারে স্পষ্ট এক প্রস্তাব রাখে, মেয়েদের বুক যদি দেখাতে হয় তার আলাদা রেট। মায়ের বুক থেকে সে মায়ের বুককে আলাদা করে ফেলে। মেয়ের বুক থেকে ব্লু ফিল্মের রেটে চলে যায়। কারণ একই বুক নানা কাজে লাগানো যেতে পারে; লাগানো হয়। প্রসাদ যেন বাস্তবতাকে, মায়ের দুধের বিকল্পহীনতার ভেতর, অন্য এক প্রকল্প স্পষ্ট দেখে। তার চতুর চোখ এবং হিসেবি মস্তিষ্ক জানান দেয় পোশাকহীন শরীরে কোন স্থানে শো করতে হলে ব্লু ফিল্মের রেট ধরাতে হবে। আবার—

> ‘‘এখন তো শরীরের সব পার্টই কাজে লাগে বুক তো আছেই, জুতো মোজার এডভার্টাইজে ধরেন উরু পর্যন্ত পা লাগছে, প্যান্টির জন্য ধরেন

পেছন লাগছে, পাউডারের জন্য ধরেন পিঠ লাগছে... এখন চুরি করে কেউ যদি ব্লু বানায়, বা আপনারাই যদি কেঁটে-ছেঁটে ব্লু বানান আমাদের লস হবে না।''[১৯]

এর মধ্য দিয়ে লেখক সমাজ বাস্তবতার এক উলঙ্গ রূপ প্রকটিত করেছেন। সমাজের নারী শরীর নিয়ে ব্যবসা করে জীবনের, মনুষ্যতের নীচতার স্তরে পৌঁছে কীভাবে মানুষ নিজের স্বার্থ পূরণ করছে প্রসাদের এই উক্তি সেই চিত্রই আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছে।

গল্পের কাহিনির ভেতর রয়েছে একটা আন্তর্জাতিক বাস্তবতা। চেতলার বস্তি অন্য সব বস্তি থেকে চেহারায় আলাদা কারণ চেতলার লোক বসতি কলকাতার আগে। এর বারান্দা, উঠোন, চওড়া রাস্তা দেখে মনে হয় এ যেন মফঃস্বলের মধ্যবিত্তের বাড়ি। একসময় এক চলচিত্র পরিচালক এখানে শ্যুটিং শুরু করেও চলে যেতে বাধ্য হয় কারণ বিদেশী জুড়ি এবং দর্শকদের কাছে এ দৃশ্য কোন প্রভাব ফেলবে না। এখানে প্রেক্ষিতটাই আসল। যা চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে তাই গ্রহণীয় বাস্তব নয়। যার কাছে ছবিটি পৌঁছে দেওয়া হবে তার বা তাদের নিরিখেই বাস্তবতার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতটিই এখানে হয়ে ওঠে দেশি বাস্তবতার গ্রহণ বর্জনের নিরিখ।

নির্মল ঘোষ, যে সারা কাহিনি জুড়ে ক্যামেরার চোখ দিয়ে বৃষ্টিপাত দেখেছে, ক্যামেরার বাইরে চোখ এনে বৃষ্টিপাত দেখেছে, এখন তার সারা শরীর ভিজে যায় এক অজানা অদৃশ্য বৃষ্টিপাতে। বৃষ্টি প্রেক্ষিত পাল্টানোর সাথে সাথে তার চরিত্র বদলায়।

বৃষ্টির নৈসর্গিকতা যেমন শহরের সৃষ্ট ব্যাকগ্রাউণ্ডে তার দৃশ্যময়তায় বদলে যায়। মায়ের দুধও সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার কারণে বদলে যেতে থাকে। যেমন নির্মল ঘোষের ক্যামেরা ম্যান থেকে প্রোডাকশন ম্যানেজার হওয়া তার ব্যক্তি ইচ্ছের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার বুকের ভেতর তাই একটা গোপন জ্বালা থেকেই যায়। এসব ঘটে মিডিয়ার নানান গতিপথ পরিবর্তনের কারণে যার সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা জড়িত। আর সেই পরিকল্পনারই এক অনিবার্য উপজাত হিসেবে মাতৃদুগ্ধের বিকল্পহীনতার স্তন ব্লু-ফিল্ম সমেত নানা কাজে লাগে।

ধীরে ধীরে নির্মল ঘোষ এই পরিবর্তীত প্রেক্ষিতের কারণে তার ক্যামেরার চোখ

হারায়, তার শিল্পী সত্তা হারায়। কেন হারায় সেই শিল্পী সত্তা তা সে জানে কিন্তু সাদা কালো থেকে রঙে যাওয়ায় ফিল্ম দুনিয়ায় কী লাভ হয় তা সে জানে না। বৃষ্টির পর প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়া ব্লু রঙটাকে দেখে সে ভাবে ভারতীয় এই রঙকে ফিল্মে ধরার ক্ষমতা নেই, অথচ রঙীন ফিল্মের দিকে ঝুঁকে আছে সব। তার অন্তরের ভেতর একজন বিগত জীবন শিল্পীর কাতরতা ফুটে ওঠে।

গল্পটির মধ্যদিয়ে একজন প্রকৃত শিল্পীর আর্তনাদকে যেন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তেমনি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাস্তবতার ছবিও উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। সমাজের চোখ বদলে যাচ্ছে। পরিচিত প্রেক্ষিত, অর্থ বদলে যাচ্ছে। মাতৃত্বের পরিচিত অর্থ বদলে মাতৃ স্তন আর মাতৃ স্তনের সারল্যে অবস্থান করে না। ব্যবসায়িক হিসেব নিকেশ, মানুষের চোখের তৃষ্ণার কাছে বিভিন্ন ভাবে তা বিকোতে থাকে।

দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্রের চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত 'অন্ত্যেষ্টির রীতিবিধি' গল্পে পরিবর্তীত সামাজিক বাস্তবতার এক অন্যগোত্রের ছবি ফুটে উঠেছে। গল্পটিতে প্রথাগত কোন কাহিনির বুনোট নেই। শব্দের পর শব্দ মোড় দিয়ে নানান শিল্প অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে লেখক পৌঁছে দিয়েছেন এক ভিন্ন মাত্রায়।

কাহিনির প্রথম পর্বে একজন বৃদ্ধের হৃৎপিণ্ড ধীরে ধীরে চারপাশের মানুষের সামনে থেমে যাওয়া, পরবর্তী পর্বে টরেন্টো নিবাসী কন্যার ছুটে আসার জন্য প্রতীক্ষা এবং দ্বিতীয় পর্বের অনির্দিষ্ট সময় বয়ে গেছে।

তবে টুনির জন্য প্রতীক্ষা 'গোডো'র জন্য প্রতীক্ষার সমান নয়। অনিত্য, নশ্বর মানব শরীরের মত বৃদ্ধের হৃৎপিণ্ডটাকে ডাক্তার রাসায়নিক দিয়ে পচনকে কিছুটা মন্থর করে দেয়। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মকে এভাবে একদিনের বেশি ঠেকিয়ে রাখা যায় না। টুনির কর্মসূচীর বিপরীতে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এর ভেতরেই শাস্ত্রীয় আচরণ বিধিও পালিত হয় মৃতের কুশ পুত্তলিকা দাহ করে। প্রাকৃতিক নিয়ম, শাস্ত্রীয় বিধি আর সামাজিক বাস্তবতার টানা পোড়নের ভেতর দিয়ে কাহিনির অবয়ব সম্পূর্ণ হয়।

প্রাকৃতিক নিয়ম এবং পরিবর্তীত সামাজিক বাস্তবতার ভেতর যে টানাপোড়েন আমরা অনুভব করি এই কাহিনির শিল্প-অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে। প্রাকৃতিক নিয়মের যে নির্দিষ্টতা

তা মানুষের কাছে অনির্দিষ্ট থেকে যায় যেহেতু স্বতঃক্রিয়তায় মানুষ চালিত হয়। যদি কেউ কখনো সেই অন্বেষণে নিবিষ্ট হওয়া যায় তাহলে তাঁর চৌহদ্দি কার্য কারণেই সীমাবদ্ধ থাকে, জীবনের নিবিষ্ট অভিজ্ঞতায় নয়। সে রকমই সমাজ বাস্তবতাও তেমন কোন সার্বজনীন উত্তরাধিকার নয় যা মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হওয়ার কারণে স্বতঃক্রিয়তায় অর্জন করে নিতে পারে। যাপিত জীবনের ধর্ম এবং যুগের মর্মকে একজন কাহিনিকার জেনে নেন জীবন ও যুগের স্মৃতি সত্তার বৃহত্তর পরিদৃশ্যের ভেতর থেকে।

কাহিনিটি তার বিষয়গত অনন্যতা অর্জন করে পরিবর্তীত সামাজিক বাস্তবতার ভেতর থেকে। সামাজিক বাস্তবতার প্রশ্নটি বাদ দিয়ে প্রাকৃতিক নিয়ম আর শাস্ত্রীয় বিধির ভেতর কোন বিপরীতমুখী টানের সম্ভাবনা থাকে না কারণ লৌকিক আচরণবিধি সামাজিক চাপে নিজেকে বদলে নেয়—মৃতদেহকে কন্যার অপেক্ষায় রেখে কুশপুত্তলিকা দাহ করে এবং মৃতদেহ দাহ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ঘরে প্রদীপ জ্বলে। আর তাই শেষ পর্যন্ত সংঘাত ঘটে নিয়মের সঙ্গে সমাজ বাস্তবতার—তাঁর জীবনহীন দেহ মৃত্যুহীন অপেক্ষায় থাকবে তাঁর জাগতিক সাফল্যের প্রতিনিধির পৃথিবীর আহ্নিক গতির বিপরীত মুখে যে তার জনক ও পিতার কাছে আসছে। কিন্তু এ দুয়ের ভেতর প্রাকৃতিক নিয়মটি তাই পরিবর্তিত সমাজ বাস্তবতা হয়ে ওঠে কাহিনির চালিকা শক্তি। আবার পৃথিবীর আহ্নিক গতির বিপরীত মুখে টুনির যে যাত্রা তা সামাজিকতাকে প্রভাবিত করে—কিন্তু অন্ত্যেষ্টিই যেখানে অনিশ্চিত, সেখানে মৃত নিয়ে অপেক্ষা করা তো আর অনিশ্চিত থাকতে পারে না। ফলে মৃতের জীবনে দ্বিতীয় দিন থেকেই সংগঠন ও সংরক্ষণ থেকেই যেন লোকসংখ্যা কমে যায়। মৃতের ঘরের ফোনটি যা টুনির কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে মৃতের সুদূর সামাজিকতাকে তুলে ধরে, সেই একই ফোন নিকটতম সামাজিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাকৃতিক নিয়মে মৃতের শরীরে অসংখ্য কৃমি জন্মায়, শরীরের ভাষা বুঝে পিঁপড়ে সারি বেঁধে আসে, ইঁদুর এগিয়ে আসে, আরশোলা পাখসাট মারে, শকুনি আকাশে চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায়—এই প্রাকৃতিকতাও তৈরি হতে পারার সমূহ সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে সমাজ বাস্তবতার অনিবার্য কার্য-কারণে।

এভাবেই লেখকের চোখে দেখা সমাজ আত্মরসে জারিত হয়ে গল্পের নূতন বুনটে কাহিনির ন্যূনতায় সমাজ জীবনের গভীর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গল্পকার দেখিয়েছেন

ব্যক্তির প্রয়োজনে সমাজের নমনীয়তার খেলা, যা বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই সম্ভব ছিল।

লেখকের গল্পসমগ্রের তৃতীয় খণ্ডের 'রক্তের অসুখ' গল্পে লেখক সমাজজীবনের নানান দিকে পরিচয় তুলে ধরেছেন। একজন ডাক্তারের মাত্রারিক্ত ওষুধ ব্যবহারের ফলে নিজের অসুখ বাঁধানো, চিকিৎসার প্রয়োজনে ফ্রেশ রক্তের চাহিদা, রক্তের খোঁজে আত্মীয় পরিজন এবং নানাজনের কাছে অনুরোধ, বন্ধু বান্ধব এবং সেইসব আপনজনদের রক্ত দেওয়ার অনুরোধ এড়িয়ে যাওয়া এবং শেষে একজন প্রফেশনাল ব্লাড ডোনারের অর্থের বিনিময়ে রক্ত দেওয়া—সংক্ষেপে এটিই গল্পের মূল কাহিনি।

কাহিনির একেবারে প্রথম অনুচ্ছেদে দুটি অস্পষ্ট প্রমুখন ঘটিয়ে দেন গল্পকার। ''ব্যস্ততাহীন স্ট্রেচারের পক্ষে যেন ঐ টাটকা রক্তে ভেজা আচলের কোন সম্পর্ক নেই।''[২০] এখানে 'স্ট্রেচার' এবং 'আঁচল' মানুষের গোত্রে পড়ে না অথচ এই দুটি শব্দ এবং তার অর্থ আমাদের মনের কোনে একটু যেন ছুঁয়ে যায়। তার পরেই 'ইনভ্যালিড' শব্দটি সমাজ সংসারের অনিত্যতার নিষ্ঠুর নিয়মকে যেন ঘোষণা করে দেয়। যাকে কেন্দ্র করে কাহিনি তাকে আগের দিন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শরীরে একটা স্থায়ী ব্যথা হওয়ায় তিনি একটার পর একটা ওষুধ খেয়ে যাচ্ছিলেন। ডাক্তার হয়েও তিনি ভুলে গেছিলেন যে, যে-ওষুধে ব্যথা কমছে তার মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগে সেই ওষুধই তাঁর পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। একসময় শরীরের রক্তের গড়ন পাল্টায়, রক্ত তৈরির উপাদানে বিপর্যয় ঘটে। তাঁর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নিজের ইচ্ছা ব্যতিরেকে নড়তে থাকে। একসময় তাঁর ইচ্ছা আর শক্তির ভেতর সব সংযোগ কেটে যায়। রোগের উৎসে পৌঁছতে গিয়েও নানা বিভ্রান্তি উপস্থিত হয়। এর বীজ রক্তের মূলে, জন্মকালে নাকি শৈশবে তা অনিশ্চিত। আবার কারো মতে তাঁর শরীরে অসুখের বীজ ঢুকেছে মাত্র কয়েকমাস আগে। একসময় তিনি চেতনা হারান ব্যধির মাত্রাতিরিক্ত কামড়ে। অচেতনে মাঝে মাঝে যে কথাগুলি বলেন তার কিছু বোঝা যায় আবার কিছু বোঝা যায় না। কথাগুলো তাঁর অতীতকে নিয়ে নাকি তাঁর ভবিষ্যৎকে নিয়ে। এখানেই যেন একটা বিভ্রান্তি এনে দিয়েছেন লেখক। তাঁর বর্তমানের উচ্চারণের ভেতরে বর্তমান নেই। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ইচ্ছা নিরপেক্ষ নড়ে, তাঁর ইচ্ছা আর শক্তির ভেতর যেমন সব সংযোগ কেটে যায়; তেমনি তাঁর উচ্চারণ এবং উচ্চারণের বিষয় এবং

অর্থের ভেতর কালগত দূরত্ব বর্তমান।

শরীর এবং চেতনার বৈকল্য এবং দূরবর্তী সংযোগের মত তাঁর রোগ এবং চিকিৎসার সম্পর্কও তদনুরূপ। যেখানে চিকিৎসা এবং রোগ দুটো পরস্পরের সাথে কার্যকারণ সম্পর্কহীন। লেখক জানাচ্ছেন—''চিকিৎসা চলছে। কী অসুখ না জেনেও চিকিৎসা। কী চিকিৎসা না জেনেও চিকিৎসা। কার চিকিৎসা না জেনেও চিকিৎসা। কোথায় চিকিৎসা না জেনেও চিকিৎসা।''[২১] এইভাবে অতি পরিচিত হাসপাতাল নামক প্রতিষ্ঠান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে বহুস্তর পেরিয়ে এই বিচ্ছিন্নতাকে তুলে ধরে তারপর রোগীর জন্য অপেক্ষারত চরিত্রগুলির ভেতর প্রবেশ করেন। এইসব চরিত্রের মধ্যে আছে তাঁর একদল ডাক্তার সহকর্মী, পরিচিত কমল সিং, মায়া নামের পরিচিত এক যুবতী, রোগীর শ্যালক রমেন, রোগীর ছেলে গানু আর উৎকণ্ঠায় পাথরের মত প্রায় নিথর রোগীর স্ত্রী। প্রয়োজন ফ্রেশ ব্লাড আর সেই রক্তকে কেন্দ্র করে হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্কের অনুপস্থিত ডাক্তার থেকে শুরু করে এই মানুষজন তাদের নানা অভিব্যক্তিতে ধরা পড়ে। রমেনের ছোটাছুটি, রোগীর স্ত্রীর কুঞ্চ রেখায় স্পষ্ট ঠোঁট এবং চেতনারহিত নিষ্পলক দৃষ্টি কিংবা কিশোর পুত্র গানুর কর্মবোধহীন দাঁড়িয়ে থাকা যেভাবে যেন অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের ছোঁয় না। যে ব্যক্তিটি এখন বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি অত্যন্ত কাছের মানুষ কিন্তু তাঁর জীবন মরণের প্রশ্নটি তাঁর সহকর্মী। তাঁর পরিচিত কোন মানুষ, এমনকি মায়ার মতো নিকট জনের মনের ভেতরে কোন আলোড়ন তোলে না। যেখানে একজন সহকর্মী মরতে যাচ্ছে তারই দুয়ারে দাঁড়িয়ে কমল আবার এক গাল হেসে বলে, 'আমার রক্তও মিলল না। হে হে' যেন তার রক্ত ডাক্তার বাবুর শরীরে ঢোকাতে পারলে খুব ফুর্তি হত। অন্যদিকে মৃত্যুপথ যাত্রী এবং পাষাণ প্রায় তার স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে মায়া হাত ধরে একটু হেসেছিল। কাকীমার চাউনি দেখে হাসিটা বন্ধ করে। রোগীর সহকর্মীদের—ধোপ-ভাঙা-জামা-কাপড়ে, একজনের ধুতি-পাঞ্জাবিতে, মাথার পেছনের পাতলা চুলে, গাঁয়ের নাইলনের গেঞ্জিতে, গোল পাকানো গল্প গুজবে, মনে হচ্ছিল এঁরা কোথাও বেড়াতে এসেছে। সহকর্মী মায়া—এদের হাসি কিংবা কুশল প্রশ্নের ভেতরে ভাব ও ভাষায় বিচ্ছিন্নতা প্রকট হয়ে উঠেছে। না আসলে নেহাত অসৌজন্য প্রকাশ পাবে—এই হেতু হয়তো তারা এসেছে।

অথচ এই কুশল প্রশ্ন আবেগের অকৃত্রিমতা হয়ে যেতে পারতো জীবনের অমূল্য সম্পদ, চরম আতঙ্ক এবং যন্ত্রণার দিনে এক পশলা আশীর্বাদ। আরও দু'জন ভদ্রলোক ধীর পায়ে রমেনের সঙ্গে হেঁটে আসে। রোগীর স্ত্রী তাকিয়ে দেখে এই দৃষ্টিপাতের কোন অর্থ কোন একদিন হয়তো ছিল, সেই অর্থের সন্ধানে অন্তত কয়েক মুহূর্ত ভদ্রলোক তাকিয়ে থাকেন সেই অস্বচ্ছ অনড়, দৃষ্টির সামনে। তারপর বহু দূর থেকে যেন জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছে সুনৃতা। দুঃখের দিনে সমাজ জীবনের এক কঠোর বাস্তবকে লেখক তুলে ধরেছেন এখানে। যখন অবস্থা ভালো থাকে কারো, প্রতিবেশীসহ আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কত না আপন হয়ে নানা স্তরের সম্পর্ক-ব্যুহ রচনা করে। যখন সেই সুখ দুঃখের দিনে রূপান্তরিত হয় অনিবার্য কালের নিয়মে তখন সেই চেনা মানুষগুলোই কেমন যেন অচেনা ঠেকে, তারা যেন দূর অতীতের কোন এক মুহূর্তের চেনা অতিথি, যাদের সাথে আর যাই সম্পর্ক থাকুক, আত্মীয়তার সম্পর্ক কোন কালে ছিল না।

রোগীর ফ্রেশ রক্ত চাই। যারা রোগীকে দেখতে এসেছে তাদের উপর স্বাভাবিকভাবে মানবিকতার খাতিরে রক্ত দান করার দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু কারো মনের ভেতরে সেই রক্ত দেওয়াতে সায় নেই অথচ মানবিকতার মুখোশটুকু পুরোপুরি খুলে নিজের উলঙ্গ চেহারাটা দেখাতেও বাঁধা ঠেকে। রমেন ডাক্তার সহকর্মীদের সাথে ব্লাড ব্যাঙ্কে যায় এবং দেখে সেখানে কোন ডাক্তার নেই আর তাই রক্ত না দেওয়ার অভিপ্রায়টি যেন একটা শক্ত যুক্তি খুঁজে পায়। রক্ত দেওয়ার দায় থেকে যা এতক্ষণ তাদের ভীতি এবং ধর্মসংকটে ফেলেছে, মুক্তি পেয়ে তাদের মনে অনাবিল আনন্দ ও প্রাণ খোলা খুশির, হাসি তামাসার জোয়ার আসে। শেষে একজন পেশাদারী রক্তদাতা আসে। সে নিজের রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থাও করে ফেলে যা সেই রোগীর এতজন বন্ধু মিলে করতে পারেনি, বলা ভালো চায়নি। রক্তের বোতল রোগীর স্ত্রীর কাছে আসে। রক্ত দিতে গিয়ে হয়তো স্ত্রী স্বামীকে দেখে আসতে পারবেন এই আশায় তিনি রক্তের বোতলটি বুকে করে এগিয়ে নিয়ে যান সেই মানুষটার দিকে যে এখন রোগের প্রতীক। ভুল পথে গিয়ে আবার অন্য পথে হেঁটে তিনি বুকের কাছে রক্ত দুলিয়ে সেই নতুন দিকেই আবার পা ফেলতে থাকেন।

হাসপাতালে ডাক্তার নেই—নিত্য দিনের অতি পরিচিত এই অভিজ্ঞতার ভেতর

গল্পকার আমাদের পৌঁছে দেন সেই সার্বিক আত্মিক সংকটে যেখানে আমাদের কর্ম প্রেক্ষিতহীন, আমাদের ভাষা ভাবহীন, সামাজিক নানা সংকটে আমাদের উপস্থিতি দায়হীন, আমাদের আর্তনাদ অর্থহীন। অসুখ রক্তে এবং সেই অসুখ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, ব্যক্তি থেকে সমাজে সংক্রামিত হয়।

ঘ. অর্থনৈতিক সংকটমূলক ছোটগল্প :

বর্ণাশ্রম প্রথায় মানুষের সামাজিক মানদণ্ড স্থির করা ছিল। সুখ স্বাচ্ছন্দ মূলত উপরিতলের মানুষগুলিই ভোগ করত। ধর্মের দোহাই দিয়ে এই বিভাজন করে আদতে নীচু তলার মানুষগুলোকে নানান অবজ্ঞার সাথে সাথে ধনহীন করে রাখত। মূলত পুরাকালে পেশাগত বিভাজন করে আদতে ধন-বৈষম্যগত বস্তুটিকেই ধর্মীয় মোড়কে চালিয়ে দেওয়া হত। কারণ একজন তথাকথিত মেথরের সমাজের উঁচু শ্রেণিতে উত্তরণ তার পেশাতে থেকেই হওয়া সম্ভব নয়। আধুনিক যুগে বর্ণাশ্রম প্রথার বিলোপ ঘটল। মানুষ তার ভালোলাগা মন্দ লাগার উপর ভিত্তি করে বা উপার্জনের সংখ্যা বিচার করে নিজ নিজ পেশা বেছে নিল। তবুও সেই পুরাতন বর্ণাশ্রম কিন্তু ঘুচলো না। এখানে একটু রদবদল হয়ে ধনের নিরীখে শ্রেণিবিন্যাস শুরু হল। স্বভাবতই শাসকের আর শোষকের মিলমিছিলে তৈরি হওয়া সমাজ এক নূতন ধনতান্ত্রিক সমাজ গড়ল। আজকের পৃথিবী যাদের অঙ্গুলি হেলনে উদয় ও অস্ত যায়। শ্রেণিগত এই বৈষম্য মানব সমাজের উদ্ভবের কিছুকাল পর থেকে আজও প্রবহমান। শুধু আদিম সাম্যবাদী সমাজে (মার্ক্সবাদ মতে) যেহেতু ব্যক্তিগত ধনের কোন প্রচলন ছিল না সেহেতু সেই সময়কাল ব্যতিরেকে ধনাঢ্য শ্রেণির দাপটে সাধারণ নীচুতলার মানুষ জীবন যন্ত্রণায় ধুকে ধুকে বেঁচে থাকে। আজ অর্থ মানুষকে উপরে বা নিচে নামিয়ে দেয় সমাজের চোখে। জীবন জীবিকার সাথে অন্বিত ব্যক্তি এবং সমাজের দ্বন্দ্ব বাংলা সাহিত্যের নানা স্তরের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেবেশ রায়ের কলমেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর বহু ছোটগল্পে এই অর্থনৈতিক সংকটের জাতাকলে যন্ত্রণাকাতর মানুষের জীবন যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে।

উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটকে গ্রহণ করে দেবেশ রায় অনেক গল্প লিখেছেন। নিজের চোখে দেখেছেন উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস, তার অর্থনৈতিক ভিত্তি, কৃষ্টি সংস্কৃতির সমাহার।

ভারত স্বাধীনতা লাভের পর এই জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। দলে দলে উদ্বাস্তু মানুষের ঢল ভারতবর্ষের দুটো রাজ্যে বেশি আঘাত হানে একটা হল পাঞ্জাব, অন্যটা হল পশ্চিমবঙ্গ। স্বাধীনতার পর এবং আরও পরবর্তীকালে মুসলমান অত্যাচারে নির্যাতিত হিন্দু মানুষ পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় চলে আসে প্রাণের ভয়ে। উত্তরবঙ্গেও এক বিশাল পরিমাণ মানুষ আশ্রয় নেয়। শুধু হিন্দুরাই এসেছিল এমনটা নয়, মুসলমান বহু মানুষ ওপার থেকে এপারে এসেছিল। তারই ফলে শান্ত উত্তরবঙ্গ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল উদ্বাস্তুর ঢলে। ফলত সামাজিক বিন্যাসের মত অর্থনীতিতেও একটা ঢেউ লাগে। তারপর জোতদার শ্রেণির হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন মানুষের কাজে পৌঁছে দেবার জন্য সরকারী নিয়ম প্রোথিত হয়। যদিও সে নিয়ম কতটা ফলপ্রসু হয়েছে তা বিতর্ক সাপেক্ষ। তবুও সামাজিক জীবন যে সেই অর্থনৈতিক ডামাডোলে আন্দোলিত হয়েইল। দেখা দিয়েছিল অর্থনৈতিক নয়া সংকট। তারই উপর ভিত্তি করে দেবেশ রায় লিখলেন তার 'জোত জমি' গল্পের মত আরও নানান গল্প। জোত জমি গল্পটি তাঁর গল্প গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

'জোত জমি' গল্পটির শুরুতেই দেখা যাচ্ছে ইস্কুলের মাঠে বর্গার মিটিং হবে। শহর থেকে বড় বড় নেতা এবং আইন কানুন জানা পণ্ডিতরা আসবে। চাষাদের বোঝানো হবে বর্গাদার কি, কীভাবে কাজ করতে হবে আইন মেনে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাতের বেলা জোতদার পদ্মনাথের ঘরে জোর কদমে আলাপ চলছে। জোতদারের বাড়ির বারান্দা, বিশাল সেই দাওয়াতে সবাই কথা বলছে গুরুতর বিষয় নিয়ে। আলোচনার বিষয় হল সরকারের ঘোষিত আধিয়ার আইনে কী আছে, কেমন করে লাগু হবে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে জোতদারের কীভাবে স্বার্থ রক্ষা করার যায়। এই আলোচনায় যে শুধু বড় বড় জোতদার উপস্থিত হয়েছে এমনটা নয়, জোত জমির সাথে নানাভাবে যুক্ত থাকা অনেকে আছে। শুধু পদ্মনাথের ঘর জামাই আসিন্দির নেই। সে না থাকাতে সমস্ত আলোচনাটাই জোলো মনে হতে থাকে সবার কাছে কারণ জামাই আসিন্দিরই আইন কানুন সব থেকে ভালো বোঝে। অন্যদিকে আলোচনাটা যেহেতু চলছে তাই পদ্মনাথকেই হাল ধরতে হয় আলোচনাটাকে কেন্দ্রিভূত করে রাখার জন্য। শরীরে এক ব্যাধি রয়েছে তার। হাঁপানির টান সহ্য করে বারবার দম নিয়ে সে এগিয়ে নিয়ে যায় আলোচনাটাকে। তার এই হাঁপানির কারণও রয়েছে তার চারিত্রিক দৈর্বল্যের

ভেতর। চীন-ভারত সীমান্ত নিয়ে যুদ্ধের বাজারে একটা মেয়ে এ অঞ্চলে উদ্বাস্তু হয়ে আসে। খড় কাঠ কুড়িয়ে কোনরকমে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে মেয়েটি। সে সময় তরাই ডুয়ার্সের নানান জায়গায় ভারতীয় সেনার ক্যাম্প বসে। তারই ফলস্বরূপ একের পর এক গ্রাম উচ্ছেদ হতে থাকে এবং বহু মানুষ বাস্তুহারা হয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে যায় জীবন নিয়ে। এই মেয়েটিও সেরকমই দিশেহারা, ছিন্নমূল এক নারী। মেয়েটি আসার কিছুদিন পর পদ্মনাথ গোলান বাড়ির পেছনে একটা ঘর তুলে দেয় মেয়েটির জন্য। ঘরটি পদ্মনাথের তৈরি এবং সেই কারেণ ঘরের ভেতরে যে ঢুকলো তার উপর পদ্মনাথ নিজ খতিয়ানের দখল নেয়। শুনতে পাওয়া যায় প্রচণ্ড শীত আর ছনের বেড়ার ফলে এই সময় থেকেই পদ্মনাথের হাঁপানির টানের শুরু হয়েছে। ষোল-সতের বছর আগের সেই কর্মের সৃষ্ট ব্যধি আজও তাকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। পদ্মনাথের গোলান বাড়ির পেছনের ছনের ঘরে যাতায়াতের ফলে সেই মেয়েটির একটি সন্তান হয়। কিন্তু সেই সন্তানের পিতা পদ্মনাথও হতে পারে আবার আসিন্দিরও হতে পারে। কারণ আসিন্দিরও শ্বশুরের অনুগমন করে গোলান বাড়ির পেছনের ঘরে যাতায়াত করতো, যতটা ভেতর বাড়িতে করতো, তার থেকে বেশি। জোতদার বাড়ির যাতায়াতমূলক সন্তান, মায়ের পরিচয়েই সেই সন্তান একদিন বড় হয়ে ওঠে। সমাজ সংসারের কেউই ছেলেটির নাম দিতে চায়নি। কিন্তু যেভাবে নদীর নাম, গাছের নাম হাটের নাম আপনা-আপনি হয়, সেরকমই সেই ছেলেটা নাম রাখা হয় একটা কৈলাশচন্দ্র পর্বত ।

মিটিং চলছে জোড় কদমে। আসিন্দির হাজির হয় একজন উকিলকে নিয়ে। উকিল শোনায় আধিয়ার নাম রাখতেই হবে কিন্তু তা আধি নং হবে না অনুমতি নং সেটা আলাদা কথা। সরকারের আইন এবং জোতদারের মন রাখা—এ দুয়ের মিলমিশ করার কথা কেউ কেউ বলে। শেষ পর্যন্ত উকিলও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারে না এবং জমিদারদের অস্বস্ত করতে পারে না। এক অনিশ্চয়তা মাঝখানে ওদের ছেড়ে দেয়। সবাই চলে যাবার পর উকিলবাবুকে বাস যাতায়াতের রাস্তায় তুলে দিতে যাবার প্রস্তুতি নেয়। ঠিক এমন সময় এগিয়ে আসে কৈলাস। সে জানায়—'মুই রানীর খালের জমিত মোর নামখান রেকর্ড করাম।' আসিন্দির চম্‌কে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বৈকুণ্ঠপুর রাজ এস্টেটের অধীনে এই জমিটা

ছিল। পরবর্তীকালে সেটা ভেস্ট হয়। মাঝে ১৯৬৭ আর ১৯৬ ৯ দুইবার যুক্তফ্রন্টের আমলে আধিয়াররা ঝামেলা করায় চাষ-আবাদ হয়নি। কিন্তু পদ্মনাথ আসিন্দিরের দখলের মধ্যেই সেই জমিটা আছে। ঘরের লোক হিসাবে কৈলাস সেই জমিটার চাষ আবাদ করে আসছে। আসিন্দির পরে কৈলাসকে জিজ্ঞেস করে বিছন কার, বলদ কার, খোয়া কার এসবের উত্তর তো চাই তার উপর বাবার নামটাও প্রয়োজন। তাছাড়া নেহাত কৈলাস ঘরের লোক হিসেবে তাকে সে জমি, বলদ দেওয়া হয়েছে চাষ করার, ফসল ফলানোর জন্য। কৈলাস আসিন্দিরের কথায় কান দেয় না। সে হালুয়া এই অধিকারেই যে সেই জমির রেকর্ড করাবে তার নামে। এরপর আসিন্দির উকিল বাবুকে নিয়ে চলে যায়। কৈলাসের প্রস্থানের ভঙ্গিতেই বোঝা যায় সেই জমির অধিকারটা যেন লুকিয়ে আছে। সে ঐ জমির সাথে, তার ধূলি কণার সাথে মেশা এক কৃষক। জমির সাতে তার সম্পর্ক নিবিড়। নিয়ম আর দলিলের বিপরীতে এই আত্মিক সম্পর্ককেই যেন খাড়া করে অধিকারটা ছিনিয়ে নিতে উদ্ধৃত। আসলে মানুষের সমাজ অন্বিত জীবন, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত জীবন ব্যক্তিগত জীবনকে এতখানিই গ্রহণের মত গ্রাস করে ফেলেছে যে ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতি কেমন যেন অবান্তর ঠেকে। চাপিয়ে দেওয়া এই জীবনের পরিবর্তে ব্যক্তির অন্তর্লীন আত্মিক আবেগ একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। অপারেশন বর্গা নামে যে সরকারী আইন আর উদ্দেশ্য মাটির সঙ্গে সবচেয়ে নিবিড়ভাবে যুক্ত মানুষটিকে মাটির অধিকার দেওয়া। এ অধিকার সম্পূর্ণ না হলেও এটা জোতদারের অধিকারের ভেতর ভাগ চাষির অধিকারকে যুক্ত করা। কিন্তু ভাগ চাষির এই অধিকার যখন সরকারী আইন হয়ে আসে তখন প্রয়োগের জায়গায় তার অভ্যন্তরীন লক্ষ্যটাই যেন গুলিয়ে যায়। তখন তা নিছক একটি আইন এবং লড়াইটা আইনের পথেই হয়। সেখানে সামাজিক বন্ধন বা হৃদয়ের কোন সম্পর্কের মূল্য থাকে না। কিন্তু এতদিন ধরে চলা জমির মালিক এবং আধিয়ারের সম্পর্ক আইন এবং অবিশ্বাসের মধ্যে ছিল না। একান্ত নিকটাত্মীয়ের মত তাদের পারস্পরিক জীবন ছিল নৈকট্য।

প্রশাসনিক আইনের গোড়ায় তাদের সেই সুন্দর সম্পর্কটিতে ঘুন ধরে গেল। আইনে বোধের চেয়ে বুদ্ধির জোর বেশি। মাটির সঙ্গে, উৎপাদিত ফসলের সঙ্গে, বীজ থেকে ফসল হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জোতদারদের সম্পর্ক কখনই নিবিড় নয় অথচফসলের ভোগাধিকার

তাদেরই। এই অধিকারে কোন দৈহিক সমর্থন নেই, মানসিক সমর্থন নেই, নৈতিক সমর্থন নেই—তাই অধিকারটা বজায় রাখতে হয় লাঠিয়াল দিয়ে, কখনো প্রশাসনের গুণ্ডাদের দিয়ে। সাতাত্তরে বামপন্থী সরকার আসায় পুলিশি সাহায্য পাওয়াটা আর নিশ্চিত থাকে না যেহেতু আইনটা সরকারের। অন্যদিকে কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ ঐতিহ্যের কারণে আইনটিকে রাইটার্স বিল্ডিং-এ ফাইল বন্দি করে রাখা যায় না। কয়েক বছর আগেই নকশাল আন্দোলনের মতো রক্তাক্ত ভূমি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। শুধু তাই নয় জোতদারদের সচেতন করা হয়নি সেটাও জোর করে বলা যায় না। এই অবস্থায় আইনের লাল ফিতার ঘেরাটোপে থেকেই আপন স্বার্থ রক্ষার করার জন্য আলোচনায় বসে কীভাবে আইনের ফাঁক গলে সবকিছু সামাল দেওয়া যায়। তাই ডাকতে হয় উকিলদের। জমির ভাগচাষি কারা—এ প্রশ্নের উত্তর গ্রামের মানুষেরা সব থেকে বেশি জানে, কিন্তু সেই জানা আইনের যুক্তিতর্কে অর্থহীন করে তুলতে হয় নানান বিছানো মনগড়া যুক্তি জালের সহযোগিতায়।

আসলে শ্রমহীন পরজীবীদের একটাই লক্ষ্য ভোগ। সরকারী জমি নিজের দখলে নিয়ে আসে পদ্মনাথ নিজের ক্ষমতা বলে। উদ্বাস্তু মেয়েটাকে পদ্মনাথ নিজের ক্ষতিয়ানওয়ালা জমিতে বাসা বেঁধে দেয়, তার জোরেই সেই মেয়েটার স্বত্তাধিকার পায়। একমাত্র মেয়ের জামাই যেহেতু আসিন্দির, সেই উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ মেয়েটিকে সেও ভোগদখল করে। তাহলে পদ্মনাথ এবং আসিন্দির সেই মেয়েটিকে, অধিকৃত খাস জমিকে, কৈলাসের শ্রমকে একাধারে ভোগ করে আসছে। তারা আধিয়ার শ্রমে সৃষ্ট উদ্বৃত মূল্য ভোগ করে এবং সেই কারণেই বর্গার মিটিং-এর ঢোলের আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে। পদ্মনাথ এবং অপরাপর জোতদারদের যে আলোচনা তার মূলে রয়েছে জমি তথা অর্থনীতি। কিন্তু যেহেতু উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে এদের অনেকের তেমন সম্পর্ক গাঢ় নয় তাই তাদের ভাষা উৎপাদনের চেয়ে উৎপাদিত শস্যের ভোগাধিকারের কাছাকাছি। জমির রেকর্ডে ভাগচাষির নাম নথিভুক্ত কৃষক আন্দোলনের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের পথ ধরে বিশেষ আইন হয়ে ফিরে আসে। উৎপাদক এবং উৎপাদনের ভেতর যে স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক সামাজিক বিবর্তনের পথ ধরে মধ্য স্বত্বভোগীর হাতে চলে গিয়েছিল, সেটাই যেন উৎস মুখে ফেরে। এখানেই বাঁধা আসে পদ্মনাথ এবং

অন্যান্য জোতদারদের কাছ থেকে। এই অধিকার যেহেতু আইনের অধিকার তাই কৈলাসকে আইনের পথ ধরেই কথা বলতে হয়। তবু সে তার যুক্তিগুলোকে নতুন করে তৈরি করতে থাকে। হাকিমের সামনে কীভাবে সে নিজের কথা বলবে তাও ভাবে, গুছিয়ে নেয় নিজের কথাগুলো। সে হালুয়া। বাবার নাম তার জানা নেই। এটুকু শুধু সে জানে তার দাবি করা মাটির সাথে তার সম্পর্ক কতটা নিবিড়। পদ্মনাথের ভাষা, আসিন্দিরের ভাষার সাথে তার বিস্তর ফারাক। কোর্টে পদ্মনাথ আসিন্দিরের দিকে পিছন ফিরে প্রবেশ করে কৈলাস। সে তাদের দিকে মুখ করে প্রবেশ করার সে স্বতঃস্ফূর্ততা তার নেই। হয়তো বহুদিন ধরে একটা সামাজিক সম্পর্কে বাঁধা এই মানুষগুলোর সাথে আইন যখন তার নির্মম হাত বাড়াল তখন হৃদয় তো আর অত কঠোরতা মুহূর্তে অবলম্বন করতে পারে না। তাই কৈলাসের পেছনদিকে প্রবেশ। কৈলাস হাকিমের সামনে কোন অকাট্য যুক্তিজাল নয়, আইনের মারপ্যাচ নয় সে শুধু তার প্রাণের কথাটুকুই বলতে এসেছিল—''হুজুর, মুই এই জমিখানের হালুয়া। মোক শিকড়-বাকড় শুদ্ধা উপড়ান, উপড়ান, হুজুর, মই এই জমির তাল-তাল মাটি নিয়া উপড়িয়া আসিম।''[২২] মাটির সাথে যার পরিচয় তার কাছ থেকেই এমন প্রাণবন্ত কথা আশা করা যায়, পদ্মনাথ বা আসিন্দিরের কাছ থেকে নয় যারা শুধু জমির ফল চেনে ভূমিকে নয়।

একটা আইনের ফলে ভূমিহীন কৃষকের লাগাতার আন্দোলনে সমাজের, সংস্কারের এমন মর্মস্পর্শী বাণী লেখক তুলে ধরেছেন গল্পটিতে। পেটের যন্ত্রণা যে বিশ্বময়, তারই প্রকাশ ঘটেছে কৈলাসের মত হতদরিদ্র ভূমিহীন মানুষের কথায়। 'কলকাতা ও গোপাল' মাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত পঞ্চাশের দশকের এক বিখ্যাত গল্প। গল্পটি পরবর্তীকালে দেবেশ রায়ের গল্পগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে স্থান পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন হঠাৎ অর্থ প্রাচুর্যে বলীয়ান কলকাতার বুকে এক মফস্বল যুবকের অর্থহীনতা বেকারত্ব এবং শেষে আত্মহত্যার পরিণতিতে গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

গল্পটিতে গোপাল নামক এক যুব নিজের চাকরি খুইয়ে হতাশায় ডুবে আছে। গতকালে সেই চাকরি খোয়াতে তার কোন হাত ছিল না। একসাথে সাতজনকে কোম্পানী তার নিজস্ব লাভ ক্ষতির আধারে বিচার করে অর্থসংকোচের পথ বেছে নেওয়াতে এই সাতজনের এমন পরিণতি। আজ সারাদিন গোপাল হন্যে হয়ে চাকরির খোঁজে বেড়িয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে

ফিরে এসেছে। চৌকির উপরে জামাকাপর না খুলেই পা ঝুলিয়ে শুয়ে পড়েছে। ঘরের আলো বন্ধ করে দিয়ে একাকী তীব্র কষ্টে, চিন্তায় আত্মমগ্ন গোপাল যন্ত্রণার নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত ফেলেনি। হাত দুটো মাথার পেছনে। গোপাল কোন দীঘনিঃশ্বাস ফেলল না। আসলে গোপালের যে যন্ত্রণা সেটা বুকের ভেতরে একাই ঘুরপাক খায়, একাকী তাকে আত্মদগ্ধ করে। কাউকে বলে, বা কোথাও নিরালায় যদি সে কান্না করতে পারত তাহলে হয়ত গল্পের শেষে তাকে চরম পরিণতি বেছে নিতে। কিন্তু গোপালের এই আত্মগত স্বভাব তাকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে মনে হয়। সারাদিন ধরে সে ডালহৌসি থেকে চৌরঙ্গি, ধর্মতলা হয়ে শেয়ালদা, সেখান থেকে শ্যামবাজার, সেখান থেকে বরানগর, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির গঙ্গা, ট্রেনে করে শেয়ালদা, শেয়ালদা থেকে কালিগঞ্জ ডিপো। এরকম চক্কর কেটে ঘুরে ফেরার পরও এখন যে সে শুয়ে আছে তার ভঙ্গিটি এরকম যেন তার কী এক কারণে ঘোরাটা শেষ হয়নি। আসলে দারিদ্রের সংসারে তার একটা কর্মস্থল চাই, অর্থের সঙ্গ তি চাই নয়তো তার জীবন্মৃত অবস্থা হতে বাধ্য।

গোপাল বরাবর আত্মগত হয়ে পড়েছে। বৃহৎ সংসারের কোলাহল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে। চাকরের ঘরে শোবার ব্যবস্থা পাকা করেছে বহুদিন হল। অথচ সেও একসময় ছিল এক প্রাণবন্ত উচ্ছল যৌবন-সমৃদ্ধ মানুষ। যখন কলেজে পড়ত-ক্লাস না করায়, আড্ডা মারায়, খুব জোরে হাসায়, তর্ক করায়, হল্লা করে পথ চলায় সে আর কারো চেয়ে কম ছিল না। গোপাল বহুবার ভেতরের সমস্ত সমস্যা জ্বালার কথা আর সবার মতো করে বলে হাল্কা হওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। সকলের যা সমস্যা সেরকম সমস্যা তো গোপালের নয়। গোপালের যা সমস্যা তা বলার, বা বোঝানোর মত কেউ ছিল না। সে সব কথা বলা যায় না, গোপালের ব্যক্তি চৈতন্য সে সব বলতে সংকুচিত হয়েছিল। মফস্বলের এই বাড়িতে তাদের বিরাট সংসার। তিন কাকা কাকিমা, তাদের ছেলেমেয়ে, নিজের সাত ভাইবোন। এতগুলো ভাইবোন যে অনেকে অনেকের নাম পর্যন্ত জানে না। ওদিকে জ্যাঠাত দাদা জ্যাঠিমাকে নিয়ে আলদা হয়ে কলকাতায় যায়, ওখানকার মেয়ে আরতিকে এই বাড়ির কেউ একজন প্রেমপত্র লেখে। তার জন্য ও বাড়ির চোখে এবাড়ির সব ছেলেমেয়ে খারাপ। একত্র বসবাসের ফলে নানা সময়ে বাতবিতণ্ডা চরমে ওঠে। গোপাল পিতৃহীন, অর্থহীন,

তার মা অনেক সময় হবিষ্যির চাল পর্যন্ত পায় না। একথাগুলো কী করে বলবে? বলা যায় না, বলতে পারত না। তাই গোপাল আপাদমস্তক অন্তর্মুখী হয়ে গেছে। তার অন্তজ্বালার খরব কেউ জানে না।

গোপাল বয়সের তুলনায় কাঁধে ভারী দায়িত্ব পড়ে গেছে অকালেই। পিতৃহীন হওয়াকে বিধবা মায়ের বড় ছেলে হওয়াতে তার উপর ভবিষ্যত অর্থ উপার্জন এবং সংসারের ভাবী ভার বহন করার স্বপ্ন পরিবারের মধ্যে থিতিয়েছিল। কিন্তু বি.এ পরীক্ষায় গোপাল ফেল করে। পরিবারে সেটা নিয়ে চরম অশান্তি হয়েছিল। কিন্তু সে সময়ই একটা চাকরি জুটে যাওয়ায় সেই অশান্তি আর দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু চাকরিটার সঙ্গে গোপাল নিজেকে মেলাতে পারছিল না। কিন্তু পরিবারের দিকে চেয়ে সেই চাকরিটা তাকে করে যেতে হয়েছিল। গোপাল এতদিন নিজের সত্তাকে ভুলে চাকরি করে গিয়েছিল কিন্তু আজ চাকরিটা চলে যাওয়াতে এখন সে নিজেকেই খুঁজে পাচ্ছে না। তার চাকরিটা যে স্থায়ী নয় সেটা চাকরিটা যখন সে পায় তখনই জানে। কিন্তু সেই চাকরি যখন অস্থায়ী হয়ে স্থায়ীর মত করে চলে যাচ্ছে, সংসারে অর্থের স্থায়ী জোগানের মত করে প্রতিমাসে মাহিনা পাচ্ছে তখন সে ভুলে গিয়েছিল যে এই স্থায়ীত্ব আসলে অস্থায়ী।

অর্থ সংস্থানের আশায় কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছিল গোপাল। বারবার মনে পড়েছিল বাড়ির দৈন্যের কথা। শহরের চারিদিকের ঔজ্জ্বল্য তাকে শান্তি দিতে পারেনি। দু-একটি জায়গায় চাকরির খোঁজ করেও আশার পথ খুঁজে নিতে পারেনি। আলোকময় কলকাতায় গোপালের সম্মিলিত পরিবারের কোন দাম নেই। শহর মানুষকে নিঃসঙ্গ করতে চায়। তার সম্পর্কিত আত্মীয় পরিজন ব্যতিরেকে। শহরের উজ্জ্বল কাঠিন্য তাকে মাতাল করে তোলে। আত্মজ্ঞান রহিত গোপালের কাছে শহর কলকাতা সৃষ্টিভ্রষ্ট। যেখানে গোপাল দেখতে পায়— ঋতু বন্ধের বিজ্ঞাপন। লেখক গোপালের এই বিজ্ঞাপন দর্শনের মধ্যদিয়ে ব্যক্তিক তথা মানবক বিনষ্টির ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেখানে ঋতু বন্ধ নারী বন্ধত্ব ডেকে আনে। কলকাতাও যেন সেই সৃষ্টিহীন, সৃজন বিমুখ হয়ে তার সামনে উপস্থিত। শুধু তাই নয় সে আরও দেখে ভ্রুণ হত্যার বিজ্ঞাপন। শহর শুধু বন্ধ্যা হয়ে গেছে তাই নয়, যতটুকু সে সৃষ্টি করেছে তাকে গলাটিপে হত্যা করতে যেন দু-বাহু প্রসারিত করে আছে। এই বন্ধ্যা, সৃষ্টিহীন শহর কলকাতার

ঘুরতে ঘুরতে আত্মহত্যার মত চরম পরিণতি গ্রহণের মত পরিকল্পনা স্থির করে নেয় গোপাল। কলকাতার রাস্তায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে এবার সে সিদ্ধান্ত নেয় কখন সে নিজেকে শেষ করবে—আজ, না কাল? সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টাও যে সেদিন করেছিল। গলায় দড়ি দেওয়া অথবা ট্রেনের সামনে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করা সহজ। কিন্তু দোকানে পাটের দড়ি না পেয়ে, আর লাস্ট ট্রেন চলে যাওয়াতে যেন তার আত্মহত্যার পরিকল্পনা আটকে যায়। কিন্তু তা হয়তো নয়। গোপাল কারো সন্তান বাবা নেই। আর মা যে একটি সন্তানের কাছে কী তা সে সন্তানই জানে, মাও তার দিক থেকে জানে। গোপাল যদি চাইত সেদিনই সে মরবে, তাহলে বহু ব্যবস্থা ছিল মরার জন্য। কিন্তু সে সব সে করেনি অথচ আত্মহত্যা যে তাকে করতেই হবে সেটা সূর্য সত্য, স্থির। মাকে হয়তো চিরদিনের মত বিদায় নেওয়ার আগে বুক ভরে ডাকার ইচ্ছা জেগেছিল। হয়তো দু'নয়ন ভরে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল অথবা মাকে শেষবার ভালো করে একবার দেখা দেবার ইচ্ছা অন্তর্চেতনায় জেগেছিল বলেই গোপাল সেদিন আত্মহত্যা করতে পারেনি। রাতে বিছানায় শুয়ে মায়ের স্মৃতি তার চেতনায় জেগে উঠেছে নানাভাবে। রাতের খাবার খেয়ে গোপাল যখন ছাদে যাচ্ছে, সিড়িতে মায়ের সাথে দেখা। তেমন কোন কথা বলার ছিল না গোপালের অথবা লক্ষ কোটি কথা বলার ছিল হয়তো। তাই বারবার মা-মা করে ডেকেছে সম্মুখে থাকা নিজের মাকে। গোপালের অন্তরের খবর না জেনে মাও স্বাভাবিক উত্তর এবং জিজ্ঞাসা করেছিল। সেটাকে কোনরকমে স্বাভাবিক করার জন্য গোপাল এদিক ওদিক করে জবাব দিয়েছিল। প্রাণ ভরে যতটুকু পারে সেই রাতেই যেন তার মা ডাক ডেকে ডেকে শেষ করতে হবে। তাকে মরতে হবে কাল। অথচ আর সবার মতো তার বাবা, মা ভাইবোন ছিল। কারো জন্য প্রেমও ছিল হৃদয়ের গোপন কোঠরে। না হলে রাতে ছাদে উঠে একটা বাড়ির ছাদের শাড়িটা কীসের ইঙ্গিত করেছে যার রং লাল। অথচ অর্থনীতির জটিল হিসেবে গোপাল বাতিলের খাতায় চলে গেছে তার সব পথ বন্ধ। কিন্তু চাকরি তো তার একার যায়নি আরও ছয় জনের গেছে। তারা তো আত্মহত্যা করবে না। তারা আবার চাকরির চেষ্টা অনবরত করতে থাকে যতদিন আর একটা কিছু না হয়। কিন্তু গোপালের মত অবস্থা তাদের কারো নেই। যে কাজ থেকে গোপাল সহ তাদের ছ'জনকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার কারণ—

বিদেশ থেকে জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানি আর তার দাম নিয়ে গোলমালে ব্যবসায়ীদের টাকা ক্ষতি (কোন ব্যবসায়ী গোপাল জানে না, কলকাতার কোন বাজারে সে তাদের দেখে নি, দেখা যায় কীনা জানে না) তাই তার চাকরি যায়। ধনতন্ত্রের এক অমোঘ নির্মম নিয়ম গোপালকে শেষ করে দেয়।

শেষ পর্যন্ত গোপাল সিদ্ধান্ত নেয় বিষ খেয়ে সে আত্মহত্যা করবে। কিন্তু বিষের জোগান দিতে পারেনি নিজেকে। বন্ধু সমরের বাড়িতেও বিষের খোঁজেই যায়। সেখানে গিয়ে দেখে সমর তার বাবার অফিস, তাদের বড় ব্যবসা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ঘর আলো করে বসে আছে। গোপাল আরও গুটিয়ে যেতে থাকে। সমর কাছেও যখন বিষ জোগার হল না তখন ক্লান্ত শ্রান্ত মৃত্যুমুখী গোপালের বড্ড ঘুম পায়। টলতে টলতে একসময় ট্রেনের ওভার ব্রিজে উঠে পড়ে। ঘুমকাতর গোপাল যেন আর একটা বিছানা পাওয়া পর্যন্ত নিজের ঘুমটাকে অপেক্ষা করাতে পারছে না। ঢলে পড়ে ব্রিজ থেকে নিচে। নিচে পড়তে পড়তে তার মনে জাগে আমার মরার কোন মানেই হয় না। একথাটি পূরণ করার আগেই চলন্ত ট্রেনের চাকায় পড়ে চির নিদ্রায় চলে যায় গোপাল।

গোপালের চোখে দেখা কলকাতা, বেকার গোপালের শিরায় অনুভূত কলকাতা একটা পাষাণ মায়া নগরী। অঢেল ধন সমেত দাঁড়িয়ে থাকে অথচ গোপালদের মত মানুষের জন্য সমস্ত দুয়ার বন্ধ। অথচ খিড়কিটুকু খুললেও গোপালের মত হাজার প্রাণ ভবিষ্যতের দিকে এগোতে পারত। অর্থনৈতিক এই বৈষম্যের নির্মম পরিহাসে গোপালের আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়, গোপাল আত্মহত্যা করে তার অনুজদের আত্মহত্যার নিশান তৈরি করে দিয়ে যায় যাতে দুবার ভাবতে না লাগে কারো আত্মহত্যা করার আগে। বিলীন হয়ে যায় শত শত পরিবার, অথচ শহরের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। পুঁজিবাদী সমাজের নিষ্ঠুর নির্মম দিক 'কলকাতা ও গোপাল' গল্পে লেখক এভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গোটা পৃথিবীকে যেন নিঃস্ব করে দিয়েছিল। আমাদের দেশ ভারতবর্ষও নানাভাবে জড়িয়ে পড়ে সেই যুদ্ধে। যুদ্ধের কড়াল ছায়া ভারতেও দেখা দিতে থাকে। অর্থ সংকট, অর্থনৈতিক মন্দা ছড়িয়ে পড়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। তারপর '৬২-তে চীন-ভারত যুদ্ধ দেশকে প্রায় দেউলিয়া করে তুলল। সাথে রয়েছে প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা এবং

অর্থপিপাসু মানুষের খাদ্য নিয়ে কালোবাজারির রমরমা। এর ফলে সারা ভারতবর্ষে দেখা দেয় খাদ্য সংকট। এরই আধারে দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্রের দ্বিতীয় খণ্ডে 'ক্ষুধায় জন্মমৃত্যু' গল্পটি নিরন্ন মানুষের হাহাকার এবং আর্তনাদে বিস্তার লাভ করেছে।

গল্পের শুরুতেই লেখক লিখেছেন—

> ''চালের লাইনটাকে পেছন থেকে দেখলে মনে হয়, সংঘবদ্ধ ও নিয়মানুগত একটা সারি, কিন্তু যে দোকান থেকে চাল দেওয়া হবে, তার বন্ধ দরজার সামনে বেলা বারটার সময় খোলার কথা—অনেকগুলি লাইনের মুখ এক হয়ে এমন একটা জটলা সৃষ্টি করেছে, সেখানে কোন নিয়ম বা রীতি মেনে নেওয়া হয়েছে মনে হয় না।''[২৩]

আটান্ন নম্বর গুদাম ঘরের সামনে নিরন্ন মানুষের এই চিত্র আমাদের বুঝিয়ে দেয় দেশ বা যে পটভূমিকাকে তিনি গ্রহণ করেছেন, সমকালীন অর্থনীতি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। অবিরত বর্ষণে এই মানুষগুলি লাইনে দাঁড়িয়ে। এক মাইলের থেকেও বেশি লম্বা লাইনের অবস্থার নানান বর্ণনা লেখক অঙ্কণ করেছেন। পরস্পরের বাক্ বিতণ্ডা, লাইন ভাঙ্গা, অন্য কেউ লাইনে না থেকেও লাইনের স্থানিক অধিকার চাওয়া ইত্যাদির পরিচিত ছবি আমরা পাই। কিন্তু অপরিচিত এই মানুষগুলির সাধ্য সাধনা এবং ভয়াল ক্ষুধার গহ্বর। লাইনের পাশেই বারান্দা থাকা সত্ত্বেও লাইনচ্যুত হবার ভয়ে তারা বৃষ্টিতে ভিজেও দাঁড়িয়ে আছে কিছু চাল পাবার প্রতীক্ষায়। যে সংকট কাল শুধু গরীব মানুষদেরই এই লাইনের মধ্যে টেনে এনেছে এমন নয়। সেখানে স্বাভাবিক অর্থসংকটহীন মানুষগুলোকেও হঠাৎ অর্থসংকট খাদ্য সংকটের বাণ ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে লাইনে। লাইনে দাঁড়ানো পা-গুলোর বর্ণনা যখন লেখক দিচ্ছেন তা থেকেই সেই অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়—মাটির ওপর পায়ের রাশি; চিত্র রাজি। কাপড় পাজামা-লুঙ্গি-প্যান্ট গুটানো নয়, একটু গুটানো, অর্ধেক গুটানো, হাঁটু পর্যন্ত গুটানো, কোমর পর্যন্ত গুটানো। হাওয়াই রবারের জুতো, খালি পা, স্যাণ্ডেল, পাম্পসু, কাবলি ইত্যাদি। চাল নেওয়ার লাইনে ছেলে, মেয়ে, যুবক, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, গর্ভবতী রমণী পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। চাইল নিতে এসেও আবার সুযোগ বুঝে যে যার মতলব গুছিয়ে নেয়। এক হোটেল মালিক তার হোটেলের জন্য চাল আনতে পাঠায় এক কর্মচারীকে। অন্যদিকে একটি ছোট

ছেলে সেই লাইনটিকে কাজে লাগিয়ে দু-পয়সা রোজগার করে। ছোট হওয়াতে চাল বিতরণকারীদের কাছে গিয়ে কান্না করে স্নেহের উদ্রেক করে আগেই চাল পাওয়ার টোকেন সংগ্রহ করে সে। এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে সে নানা জনের চাল কয়েকটা পয়সার বিনিময়ে তুলে দেয় লাইনের কষ্ট থেকে বাঁচা কেনা মানুষকে।

অর্থসংকট খাদ্য সংকটের এই চূড়ান্ত মুহূর্তে কালো বাজারির তাদের জাল ফেঁদে বসে। অধিক লাভ ছাড়া তারা চাল বাজারে না ছাড়ার কারণে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছিল। সরকার সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে সেই আড়তদারদের সাথে রফা করে। চড়া দামে চাল কিনে জনগণের কাছে বিলি করার সিদ্ধান্ত নেয় ন্যায্য অল্প টাকার বিনিময়ে।

দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে অনাহারক্লিষ্ট এক বৃদ্ধ বৃষ্টি ভেজা কাঁদার মধ্যেই পড়ে যায়। মানুষের সে সহ্য করতে পারছিল না আর। লাইন না ভেঙ্গেই লোকগুলো তাকে লাইন না ভেঙেই লোকগুলো লাইন না ভেঙেও তাকে ধরে থাকে যতক্ষণ এম্বুলেন্স না আসে। এখানে একটা বিষয় দেখা যায়, লাইনে থাকা কোন মানুষ কিন্তু লাইন থেকে বেরিয়ে এসে বৃদ্ধটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করেনি। কারণ লাইন যদি তাকে বের করে দেয়। চাল যদি সে না পায়, এই বৃদ্ধের অবস্থা তারও হবে এবং সেটা হয়তো সপরিবারে। এই সময়কালেই ঘোষণা করা হল মেয়েদের লাইন যেখানে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে তাদের চাল দেওয়া হবে না। তাদের লাইন হবে দুই নম্বর শেডে। হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচিতে ভরে ওঠে সেই স্থানটি। সবাই এক সাথে দৌড়তে শুরু করায়, বিশৃঙ্খলভাবে হুড়হুড়ি বেঁধে যাওয়ায় কে যে কার ওপর দিয়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই। সেই যুদ্ধে এক বৃদ্ধা ছিটকে পড়লে সিমেন্ট বাঁধানো আঙিনায় পড়ে মুখ ও মাথা দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করে। অন্যদিকে গর্ভবতী মেয়েটারও পেটে ব্যথা অনুভূত হয়। বিশৃঙ্খল ক্ষুধার্ত নারীদের ঠিক লাইনে নিয়ে আসার জন্য শুরু পুলিশের নিদারুণ শাসন অতঃপর সেই সারিবদ্ধ পুলিশ বাহিনী আড়াআড়ি করে লাঠি ধরে মেয়েদের দঙ্গলটাকে শেড়ের বাইরে ঠেলতে লাগল। আর পরস্পরের চুলের মুঠি ধরে পরস্পরের শরীর ছিঁড়তে ছিঁড়তে, পরস্পরের বুকের ছেলেকে পিষতে পিষতে সেই মেয়েদের দঙ্গলটা ক্রমাগত চালের বস্তা থেকে দূরে ও আরো দূরে সরে যেতে লাগল।

আহত সেই বৃদ্ধা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দেখতে পেল শষ্য শ্যামল পাকা ধানের মাঠ। যে মানুষগুলো এতদিন অভাবের ছোঁয়াটুকু পায়নি, এভাবে ক্ষুধার অন্ন জোগাতে অমানুষিক যাতনা সহ্য করতে হবে ভাবতে পারেনি, বৃদ্ধার মৃত্যুর পূর্বের এই দর্শন যেন পুরাতন জীবনকে এক পলকে স্মরণ এবং নতুন স্বপ্নের উন্মেষ ঘটিয়ে গেল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের কৃষকদের মত। বৃদ্ধার মৃত্যুর সাথে সাথেই, মাছের বাজারের শেড থেকে ভেসে আসে সেই গর্ভবতী নারীর জন্ম দেওয়া সন্তানের কান্না। একদিকে মৃত্যু অন্যদিকে নবজন্মের মধ্যদিয়ে লেখক এক গভীর দর্শনের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। হতদরিদ্র, নিরন্ন মানুষগুলো ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় এভাবেই মৃত্যু পর্যন্ত ধুকে ধুকে জীবন সাঙ্গ করবে অন্যদিকে সেই নবজাতক তারই উত্তরসুরী হয়ে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সেই মিছিলে পা বাড়াবে যেখানে ক্ষুধার রাজ্য। চাল বিতরণের পর সরকারের ঘোষণা—"এক বাজারে সরকারী চাউল বিক্রয় কেন্দ্রে কিছু নারী লুণ্ঠণ করিতে যাওয়ায় পুলিশ উহাদের বাধাদান করে। ভিড়ের চাপে ঘটনাস্থলে একটি বৃদ্ধার আকস্মিক মৃত্যু হয়।"[২৪] এভাবেই ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নিজের মুখোশে বিশ্ববাসীকে ভুলিয়ে রাখে। গল্পের এই শেষটায় এসে অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত মানুষের কান্নার বিপরীতে শাসকের উলঙ্গ রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থনৈতিক সংকট এবং সেই সংকটকে কাটিয়ে ওঠার আর এক দ্বান্দ্বিক চিত্র পাওয়া যায় দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্রের দ্বিতীয় খণ্ডের 'দখল' গল্পে। এখানে জোতদারী শোষণ, সরকারী আইনের জটিলতায় ভূমিহীন কৃষকের অর্থসংকট এবং জীবনকে বাজি রেখে তা থেকে উত্তরণের কথা বলা আছে।

লেখক গল্পটির প্রেক্ষাপট গ্রহণ করেছেন উত্তরবাংলার জলপাইগুড়ি জেলাকে। জলপাইগুড়ি জেলার পাহাড়পুরে দুই একজন কৃষক ছাড়া আর সবাই আধিয়ার। পাহাড়পুরের অধিকাংশ জমি আলি সাহেব ও খান বাহাদুরের। এখানে কোনদিন জোতদার ও আধিয়ার পরস্পর পরস্পরকে নিয়মানুযায়ী পাওনাগণ্ডা দেয় না অন্য অনেক অঞ্চলের মানুষের মত। তাই জোতদারের ধান খাওয়া আর আসামি হয়ে কাছারি যাতায়াত তখনকার দিনে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বলা চলে। পাহাড়পুরের অধিকাংশ আধিয়ার ভূমিহীন, তাদের ঘর বাড়ি গরু, লাঙল সমস্তটাই জোতদারের। ভূমি আইন লাগু হওয়ার পর জোতদারেরা

অপছন্দের, অন্যায়কারী আধিয়ারদের উৎখাত করতে শুরু করে। বহু চাষা এভাবে জমি থেকে উৎখাত হয়ে অন্নহীন, ভূমিহীন, গৃহহীন হয়ে পড়ে। ভূমি থেকে উৎখাত হয়ে গত দুই বছর এর বাড়ি ওর বাড়িতে জনমজুর খেটে কোনরকমে জীবন বাঁচিয়ে রেখেছে ড্যামনা, অরিদাস, খোদাবক্স, জগু এবং অমনি। দুই তিন বছর ধরে জেগে ওঠা নদীর চরে আবাদ করার কথা ভাবে এরা। কিন্তু হাল, বলদ, বিছন, বাড়িঘর না থাকলে তা সম্ভব নয়। তাই তারা মাতব্বর বকরুদ্দিনের কাছে যায়। বকরুদ্দিন জমি দেখে তাদের হাল বলদ দিতে রাজি হল। পাঁচজন কৃষক মিলে সেই চরে দোকুঠিয়া হয়ে কাজে নেমে পড়ে। বিস্তীর্ণ চরায় কাশবনে আগুন দেয়।

অন্যদিকে ধূপগুড়ির তিলকচন্দ্র একজন দেউনিয়া। একদিন সে আরো জনা সাতেক লোক সমেত অমনিদের ধমক দিয়ে যায়। বলে যায় এই জমি সে সরকারের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছে। তাই এই জমি তার। কিন্তু তিলক চন্দ্রের কথায় এরা কান দেয়নি। তারা যে যার নিজের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এমতবস্থায় তিলকচন্দ্র পাঁচজন লোক নিয়ে এসে চরের দক্ষিণ পুব কোনার সীমায় আগুন দেওয়ালো এবং আরও পরে পাঁচজন এনে মাচান বাঁধতে শুরু করে। ড্যামনা খোদাবক্সরা বুঝে যায় তিলক চন্দ্র ছাড়বে না। বকরুদ্দিন তিলকচন্দ্রের সেই ইজারা নেওয়ার কথাটা জামাইকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নিতে চায়। বকরুদ্দিন জানে সরকারি শিলমোহর থাকলে সেখানে তার কোন জোর খাটে না, জবরদস্তি করলে হিতে বিহিত হওয়ার সম্ভাবনা। জামাই খবর দেয় তিলকচন্দ্রকে তিলকচন্দ্র ধূপগুড়ি কালটিভেটর্স কো-অপারেটিভের নামে চরটার দখল চেয়েছে কিন্তু পায়নি। বল সঞ্চয় করতে থাকে ভূমিহীন জামনা খোদাবক্সরা। জমিতে ধান লাগিয়েছে তারা। ধানও খুব ভালো হয়েছে। তিলকচন্দ্রের সমস্ত লোভ সেই ফসলের দিকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা, আর্থিক ক্ষমতার সাহায্যে, লোকবল দিয়ে সেই কাঙ্খিত ফসল তোলার পরিকল্পনা করে। যেখানে জীবনের প্রশ্ন, যেখানে ক্ষুধার প্রশ্ন সেখানে আর বসে থাকলে তো চলে না। মাতব্বর তিলকচন্দ্রের বিরুদ্ধে বকরুদ্দিন, ড্যামনা যুক্তির পর যুক্তি সাজাতে থাকে কী করে সেই জমির ফসল ঘরে তোলা যায়, সে জমির দখল ধরে রাখা যায়। বকরুদ্দিন সাহস পায় না কিছুতেই। কিন্তু অমনিদের তো সে জমি ছেড়ে দিলে চলে জীবনের ভয়ে, তিলকচন্দ্রের ভয়ে। কারণ জমি

ছাড়ালে, ফসল ছাড়লে তাদের এমনিতেও জীবন যাবে। তাই অমনি বলে ওঠে—''আর না না-কহেন দেউনিয়া, হামরালার পাঁচজন যাই, ধান কাটা শুরু করি। কায় আসিবে, কখন আসিবে, উ আর না হয়।'' শেষ পর্যন্ত ডেঙ্গুয়াঝাড়ের মদেশিয়াদের সাহায্য নেওয়া হবে স্থির হয়। ডেঙ্গুয়া ঝাড়ের কুলিদের সাপ্তাহিক ছুটি বুধবার। তারা পঞ্চাশ জনের মত আসবে তীর ধনুক নিয়ে। নির্দিষ্ট দিনে অমনি, ড্যামনারা ধান কাটতে যায়, তাদের সাথে মিশে যায় মদেশীয় সেই তীর ধনুকওয়ালা ডেঙ্গুয়াঝাড়ের কুলিরা, অন্যদিকে এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বুক পেতে দিতে লড়াই-এ সামিল হতে নৈমুদ্দিন, সুখেন আদিতুল্লা পাহাড়পুরের সমস্ত চাষিরাও এসে পড়েছে। এইভাবে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল গৃহহীন ভূমিহীন চাষিদের এক সংগ্রামের চিত্র এঁকেছেন লেখক। এই চাষিরা যখন একক তখন শক্তিশালী কোন জোতদার বা মহাজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি এবং সামর্থ তাদের থাকে না, থাকার কথাও নয়। কিন্তু সংগঠিত কৃষক এক লহমায় নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিতে, অত্যাচারীর বিষ দাঁত তুলে নেওয়ায় কতটা পারঙ্গম ড্যামনা, খোদাবক্সের জীবনযুদ্ধের কাহিনির ভেতর দিয়ে লেখক দেখিয়ে দিলেন যেন।

দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্র তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'মূর্তির মানুষ' গল্পে অর্থনৈতিক দৈন্যের পাঁকে পড়ে মানবাত্মার করুণ পরিণতির চিত্র এঁকেছেন লেখক। গল্পটির নামকরণের মধ্য দিয়েই বোঝা যায় মনুষত্যের চরম নিরর্থকতার ইঙ্গিত।

'মূর্তির মানুষ' গল্পে আধিয়ার চর্চাই উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের কৃষক শ্রেণির প্রতিনিধি। স্বরূপ কিনু অবহেলিত উত্তর বাংলার লোকশিল্পীর পরিচয় তুলে ধরতে টটাইয়ের হুবহু একটি মূর্তি তৈরি করেছিলেন। তারপর গ্রামের সহজ সরল নিরীহ মানুষ টটাইকে সেই মূর্তিটার মতো সাজতে হয়েছে। টটাইয়ের পাশে সেই মূর্তিটা। মূর্তিটাকে প্রথমে লাঙল কাঁধে কৃষক তারপর ধানের গোছা বুকে কৃষক ও আজ ধান ঝাড়াইয়ের কৃষক সাজানো হয়েছে। কিনু দাদার আদেশ টটাইকেও আজ ধান ঝাড়াইয়ের কৃষক সাজতে হবে। মূর্তিটার মতো হতে গিয়ে টটাই মূর্তির সাথে একাকার হয়ে গেছে—''গত কয়েকদিন ধরে টটাই প্রায় ভুলেই গেছে যে মূর্তিটারই আসলে তার মত হওয়ার কথা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে কতটা মূর্তির মতো দেখতে, এই মেলাতে টটাইকে প্রায় ভুলিয়েই দিয়েছে যে, মানুষ মানুষেরই

মতো হয়।''[২৫] প্রতিদিন মেলায় অনেক মানুষের সমাগম হয়। মূর্তির মতো হতে গিয়ে টটাইকে কঁধে লাঙ্গল, হাতে কুলো নিয়ে দীর্ঘ সময় মূর্তি হয়ে থাকতে হয়। কোনটি মানুষ আর কোনটি মূর্তি তা যেন সমাগত দর্শকেরা বুঝতে পারে না। গিরির শাসনে সে বাধ্য হয়েছে নিঃসাড় মূর্তি হয়ে থাকতে। অথচ এভাবে তিন সপ্তাহ ধরে থাকতে থাকতে তার গায়ের চামড়া ফেটে, ভেজে, পচে, শুকিয়ে ধানের তুষের মত হয়ে গেছে। তাকে দেখতে মানুষের ভিড় কিন্তু সে চোখে দেখতে না পেয়ে আন্দাজ করে নেয় আওয়াজ শুনে, গন্ধ শুকে, ছোঁয়া বুঝে। এইভাবে দিনের পরদিন শোষিত, নিপীড়িত হতে হতে টটাইয়ের মনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ বিদ্রোহ করে—

> ''এনং করি কহিছে য্যান তামান রাজবংশী গিলান এই মেলাত আনি দিছে। যত এনং কথা কহিছে, মানষি আসি তত ভিড় জমাছে, এত রাজবংশী রাজবংশী কহিবার ধইচ্ছেন্। রাজবংশী বলিতে তো এক টটাই আর ঐ মূর্তি।''[২৬]

মাইকে বাজানো হয় 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে'। কেনুদা টটাইকে আদেশ দেয় গানের তালে ঠোঁট নাড়াতে, যাতে মেলায় আগত মানুষদের মূর্তির ঠোঁট নাড়ানো দেখে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে। কিন্তু তিন তিনটা সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মূর্তি হয়ে থাকতে থাকতে টটাই নিজের গলায় সুরের সঙ্গে নিজে মিল রাখতে পারে না। কিনুদার মত সুবিধাবাদী শ্রেণির মানুষের কাছে টটাইয়ের প্রশ্ন 'কিনু দাদা আর কত গিলান টটাই বানিবে হে?'

উত্তর বাংলার রাজবংশী মানুষের প্রতিনিধি টটাইয়ের মধ্য দিয়ে লেক সমগ্র রাজবংশী মানুষের আর্থিক দৈন্য এবং জীবনযন্ত্রণার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক নানান অভিঘাত উত্তর বাংলাতেও এসে পড়ে। অর্থনীতির ভাঙন, নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে না পারা, উদ্বাস্তু আগমনের ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোয় টান সব মিলিয়ে রাজবংশীদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায়। আবার ষাটের দশকে বর্গা প্রথা, আধিয়ার উচ্ছেদ এসবের ফলে বহু মানুষ ভূমিহীন হয়ে যাপনের সামান্য প্রয়োজনটুকু মেটানোর জন্য নানান পেশায় নিযুক্ত হয়। অথচ তাতে তার প্রাণের কোন টান নেই। টটাই এখানে ব্যক্তি সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে মধ্যস্বতভোগী কিনুদার অঙ্গুলি হেলনে লোকের

মনোরঞ্জনার্থে মেলার মধ্যে দিনের পর দিন তাকে মূর্তি হয়ে থাকতে হয়। ব্যক্তি সত্তার এই বিলোপে টটাই নিজেকেই ভুলে গেছে। প্রভেদ করতে পারে না সে কোন কালে মানুষ ছিল, নাকি মূর্তিই ছিল বরাবর। হতভাগা, দরিদ্র মানুষের আত্মযন্ত্রণা গল্পটিতে করুণরূপে প্রতিভাসিত করেছেন লেখক।

দেবেশ রায় গল্প লেখা শুরু করেন পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্ব থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জনিত আর্থিক মন্দা তখন পর্যন্ত গোটা পৃথিবী সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। তারপর ষাটের দশকে প্রতিবেশি চীনের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ভারত। পাশাপাশি বাংলার রাজনীতি সেসময় ঘনঘন সরকার পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে সরকারের স্থায়ীত্ব ছিল না। আবার পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, ফলে উদ্বাস্তু মানুষের ঢল দেখা দেয় সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর মতো পশ্চিমবঙ্গেও। এই নানাবিধ কারণে গোটা ভারতের মত পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানুষের আর্তনাদ, জীবনযন্ত্রণা লেখক চোখের সামনে দেখেছিলেন। যুক্তফ্রন্টের আমলে অপারেশন বর্গা, আধিয়ার প্রথার নানারকম কলাকৌশলে, প্রশাসনিক নিয়ম কানুনের ফলে পুরনো সামাজিক অর্থনৈতিক বুনোট ভেঙে যায়। অন্যদিকে আইনের ফাঁকফোকরের সুযোগ জোতদার জমিদারের আর্থিক শক্তি এবং লোকবলের কাছে হার মেনে বহু এদেশীয় সাধারণ কৃষক উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। গৃহহীন আশ্রয়হীন মানুষের আর্তনাদ নানাভাবে দেবেশ রায় তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্পে। অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার নির্মম নিয়মে লাভ লোকমানের ওঠা নামায় অনেক মানুষের জীবন ছিল কচুর পাতায় জলবিন্দুর মতো টালমাটাল। গ্রাম এবং শহুরে বা মফঃস্বলী মানুষের আর্থিক সংকট প্রাণবন্ত হয়েছে লেখকের কলমে।

ঙ. দাম্পত্য জীবনমূলক ছোটগল্প :

জীবনের ক্রম পর্যায়ের এক ধাপ দাম্পত্য। সামাজিক কাঠামো নির্দিষ্ট এই দাম্পত্য জীবন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। যৌবন থেমে মৃত্যু পর্যন্ত প্রসারিত এই দাম্পত্য জীবন নানা ঘাত-প্রতিঘাততে তরঙ্গায়িত হয়। এই জীবনের প্রত্যেকটি বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে থাকে ব্যক্তিভেদে নানান রহস্য, জটিলতা। সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ দাম্পত্য

জীবনের কলকাকলিতে পরিকীর্ণ। তাই দাম্পত্য জীবন নানানতর কথায়, ভাবনায়, আজও কথাসাহিত্য থেকে শুরু করে কবিতা, নাট্য সাহিত্য অন্যতম জায়গা জুড়ে আছে। একালের কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়ের লেখায় দাম্পত্য জীবনের তারই একটা ভিন্নতর রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

এই দাম্পত্য জীবনের অতি সাধারণ একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই দেবেশ রায়ের কয়েকটি ছোটগল্পে। গল্পসমগ্র চতুর্থ খণ্ডের 'যৌবন বেলায়' গল্পে দেখি সংসারের নিত্য দিনের নানান কথায় পল্লবিত হয়ে উঠেছে দীপক-অরন্তিকার দাম্পত্য জীবন। দেবেশ রায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার পদ্ধতিতে সেই জীবন জীবন্ত চিত্রের মত আমাদের চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে। গল্পে দীপক একজন সাধারণ চাকুরে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার সম্পর্কে আমাদের সকলের ধারণা রয়েছে। দীপকের সংসার তারই প্রতীক। নিত্যদিনের মতো গল্পে উল্লিখিত দিনটিতে ও অফিস থেকে ফিরে সে অফিস ফেরত জামাকাপর সমেত একটু জিরিয়ে নিতে থাকে। কিন্তু তাকে জানান দেওয়া হয় মেয়ে তানির বই এখনো কিনে দেওয়া হয়নি। তানির এবার ক্লাস নাইন-এ উঠেছে পনের-ষোল বছরের মেয়ে। বেশ কিছুদিন হল তানির নূতন ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। বই ছাড়াই তানি স্কুলে যাচ্ছে। আজ যদি তাকে বই কিনে দেওয়া না হয়, যে পরের দিন থেকে আর স্কুলে যাবে না। অগত্যা দীপক তৈরি হয় স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে বই কিনতে যেতে। কারণ যাই যাই করে বই কিনে দেওয়া আজও হয়নি অথচ বিষয়টা বড় বেমানান হয়ে যাচ্ছে। দীপকের স্ত্রী অবন্তিকা সাধারণ পরিবারের স্ত্রী। অনেক গৃহ বধূর মতো সেও একটুতেই হাজারো উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, অমঙ্গল ভেবে ভেবে পাগল হয়ে থাকে সংসারের অন্য দুটি প্রাণীর যারা বাইরে যায় প্রতিদিন তাদের নির্ধারিত সময় বাড়িতে না ঢুকলে নিত্যদিনের স্বামী-স্ত্রী-মেয়ের ছোট্ট সংসারের নানা ছোট ছোট ঘটনাতে নিত্যদিন তাদের মুখরিত হয়। বই কেনার জন্য মেয়ে তানি, স্ত্রীকে নিয়ে দীপকের কলেজ স্ট্রীট-এ যাওয়া, স্ট্রীটের ফুটগুলোতে লোকের ভীর, ঠেলে হিঁচড়ে বই খোঁজা ইত্যাদিতে গল্পটি প্রলম্বিত হয়েছে অনেকটা। বহু চেষ্টা আর ঠেলাঠেলির পর ভারত লাইব্রেরিতে দীপকের বই কিনতে ঢোকা, সেখানের ভীড় থেকে দূরে থাকতে মেয়ে তানিকে নিয়ে অবন্তীকার বাইরে ঘোরাঘুরি আর এক পথে পরিচয় হওয়া, তাদেরই মত বই কিনতে যাওয়া এক মহিলার সাথে। তাদের

এই সাধারণ ঘটনাকে হঠাৎ একটা জটিল দিকে মোড় নেয়। দুই তিনজন মহিলা পুলিশ এসে তানি, মা, অবন্তীকা, আর সেই মহিলাকে হাত ধরে টেনে পুলিশের গাড়িতে তুলতে যায়। আকস্মিক এই ঘটনায় তারা যেমন হতভম্ব, তেমনি ভীড়ে ঠাসা কলেজ স্ট্রীটও একটা নতুন জটলার সৃষ্টি করলো যাতে ও পথ দিতে যাতায়াত প্রায় বন্ধ হওয়ার সমিল। এদিকে দীপকও ছুটে আসে। জানা গেল নির্দিষ্ট এলাকায় থাকা বেশ্যারা আজকাল খদ্দের ধরার তাগিদে কলেজ স্ট্রীট পর্যন্ত আসে। তাই লোকাল থানার থেকে এই পদক্ষেপ। সেই পদক্ষেপেরই একটা অংশীদার হয়ে দাঁড়িয়েছে অবন্তীকা, তানি, আর সেই ভদ্র মহিলা। শেষ পর্যন্ত পুলিশ সর্বসম্মুখে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তাদের সেই পদক্ষেপ কতটা যে সত্যি, পুলিশ ভ্যানে থাকা মহিলাদের দেখাতে থাকে যাদের এভাবেই ধরা হয়েছে। শুধু বোঝার ভুলে অবন্তীকা, তানি আর ঐ ভদ্র মহিলাকে বেশ্যা ভেবে গাড়ি তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। অবন্তিকা পনেরো-ষোল বছরের হওয়ার পরেও ধরার কারণ সে সেদিন শাড়ি পড়ে বেরিয়েছিল। সেই তিক্ত, অভিজ্ঞতা, জটলা সমস্ত কিছু ঠেলে বাড়ি ফিরে পরিবারের তিনজনই স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে, বলা ভালো স্বাভাবিক হওয়ার ভান করে। কিন্তু গলার স্বর, কথা কেমন যেন স্বাভাবিক হতে পারে না। রাতে তানি একাই শোয়। যে রাতে অবন্তীকা তাকে নিজের কাছে রাখতে চাইলে অবন্তীকা জোড়ালো প্রতিবাদ করে ওঠে। এতদিন তানিকে যে শিশু ভাবা হত, কিশোরী পর্যন্ত তাকে ভাবতে পারছিল না দীপক, অবন্তিকা, আজকের এই প্রতিবাদ যেন সেই ভাবনাকে ছিন্ন করে বাস্তবে দিনের আলোয় মাঝে এনে ফেলে দিল যে, তানি আর ছোট নেই। সমাজ তাকে আর ছোট বলছে না। তার ভেতরে গড়ে উঠেছে ব্যক্তিত্ব, আত্ম অহংকার। কৈশোর থেকে নেমে এসেছে যৌবন নামক জীবন চক্রের ধাপে।

গল্পটিতে একটা সাধারণ ছোট পরিবারের কথা, তার হাসি তামাসা সহ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সন্তান সন্ততির জীবনের নানান স্তরে উঠার সময় পিতামাতার ভাবনার ভাঙন ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে।

দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্র, পঞ্চম খণ্ডের 'মুখের দরদাম' গল্পে একেবারে আধুনিক যুগের বহিঃকর্মে ব্যস্ত, পুরুষের সম উপার্জনকারী স্ত্রী এবং পুরুষের নানান জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকটিত হয়েছে। স্ত্রী কনকের ভাবনার অনুষঙ্গেই গল্পটির বিস্তার।

কনক একজন টি.ভি. রিপোর্টার। আধুনিকতা নারী। কনকের সাথে স্বামী প্রিয়বদনের বিয়ে না করে Live in করার প্রসঙ্গ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কতটা আধুনিক মনস্ক। সমাজ কথিত পুরনো ধ্যান-ধারণার দূরবর্তী তাদের চিন্তাধারা এবং সম্পর্ক। যদিও তার আচার-আচরণ এবং ভাবনা চিন্তার ফাঁক-ফোকর দিয়ে চিরায়ত স্ত্রীর তথা নারীর যে রূপ তা ফুটে উঠেছে। সেই কনকের স্বামীসহ সে একই টি.ভি. কোম্পানিতে একটা সময় চাকরি করত। প্রিয়বদন মিতভাষী। সে ক্যামেরা ম্যান। তার কাজের নাম ডাকও আছে। কিন্তু প্রডিউসার প্যাটেল প্রিয়বদনের কাজে নিজের করে আর একটু আশা করতে গিয়ে প্রিয়বদনের সাথে তার বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সে এখন ফ্রি লাউন্সিং করে অন্য জায়গায়। একই কোম্পানীতে কাজ করা কনক কিন্তু আজও রয়ে গেছে। সাধারণভাবে প্রথাগত সংসারের নিয়মে কনকেরও সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও কাজ নিতে হত অথবা স্বামী-স্ত্রীতে এই বিষয়গুলো নিয়ে ঝগড়া, মন কষাকষি হত। এখানে কিন্তু তার একফোঁটাও হয়নি। তারা বড় প্রফেশনাল।

আবার প্রোডিসার প্যাটেলও যে প্রিয়বদনকে অপছন্দ করে তা নয়। কনকের কাছে যখন নির্দেশ আসে বিহারের পাবারিয়ায় ঘটে যাওয়া পুলিশি অত্যাচার এবং সেখানকার নারীদের উপর গনধর্ষণের বিষয়ে ভিসুয়ালি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে, এবং এই কাজে যাবার প্রাক্কালে যখন কনক নিজের ক্যামেরা ম্যান স্বামীকে নেওয়ার প্রস্তাব রাখে তখন প্যাটেলের কথায় জানা যায় প্যাটেলও কতটা ভক্ত প্রিয়বদনের দক্ষ কর্মে। কিন্তু কনক এই কথাটি নিজের স্বামীকে কীভাবে বলবে সেটা ভেবে পাচ্ছেন না। সাধারণ দাম্পত্য জীবনের আঙিনায় মেয়েলী ঢঙে এই কথা স্বামীকে জানানোয় কোন স্ত্রী এতটা ভাবতে বসতেন না। কিন্তু এখানে দাম্পত্য জীবন বড় নিস্পৃহ। সেখানে একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে নিজের নিজের পেশা, তার দায়াবদ্ধতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, উচ্চশিক্ষিত দাম্পত্যে যেমন প্রথাগত স্বাভাবিক দাম্পত্যে একটা নতুন সমীকরণ তৈরি করে দিয়েছে কনক আর প্রিয়বদনও সেই সমীকরণের অংশীদার।

অন্যদিকে কাহার সম্প্রদায়ের মত সমাজে নীচু জাত খ্যাত নানকু কাহারের ইতিহাস বিবৃত 'হাড়কাটা' গল্পে সম্বলহীন চাটাইয়েরা সংসারের মাঝে অল্প মধুর দাম্পত্য আচম্বিতে যেন ঝিলিক মেরে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। নানকু কাহারের পাথুরে হৃদয়ে যখন লাভাস্রোত বয়ে যায় তখন, তখন তার অবরুদ্ধ প্রেম উদ্দাম গতিতে ছুটে চলে সমস্ত পাহাড়

ডিঙিয়ে।

নানকু কাহারকে লেখক নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিনিধি স্থানীয় করে এঁকেছেন গল্পে। বর্ণে যেমন সে নিম্নবর্গীয়, তেমনি অর্থেও বটে। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের লাইসেন্সিয়েট কশাই নানকু কাহার। প্রতিদিন গোটা পৃথিবী যখন ঘুমে অচেতন, সেই সাত সকালেই তাকে দোকানের সাটার তুলে পাঁঠা কেটে নিজের দোকান সাজিয়ে নিতে হয়। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে যখন সে পাঁঠা কাটে তখনই দোকানের দরজার কাছে একটা কুকুর প্রতিদিন এসে হাজির হয়। নিম্ন বর্গের, অর্থহীন নানকুর যেমন পড়শী পরিজন নেই, বন্ধু-বান্ধব নেই তেমনি কুকুরটারও একই অবস্থা। চামড়া ওঠা লেজকাটা অপাংক্তেও এই কুকুরটার সাথেই যেন তার জীবনের মিল। সাত সকালের বাজারে যখন নানকু একা, তখন ঐ কুকুরটাই একমাত্র তার সাথী হয়ে দাঁড়ায়।

> ''কাক-না-ডাকা বিহান বেলায় নানকু যখন ওর মানুষের মনটাকে নিজের ঘরের বিছানার উষ্ণ আলিঙ্গনে রেখে দিয়ে কশাই মনটাকে নিয়ে এই ঘরের রক্তাক্ত, ভেজা, বুড়ো থুত্থুরে অন্ধকারে মধ্যে ঢোকে—একেবারে বিচ্ছিন্ন, একেবারে একা, সেই জগতে আর কোন দোস্ত নেই নানকুর ঐ পেছনে ঘা-ওয়ালা, সমস্ত শরীরের লোম উঠে যাওয়া কুকুরের চকচকে হ্যাংলা চোখ দুটো ছাড়া।''[২৭]

'নানকু ওর নাম দিয়েছে দোস্ত।' তাই প্রতিদিন সেই দোস্তকে মাংসের অবিক্রিত অংশ, হাড়তন্ত্রী ছুড়ে দেয় ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের জন্য।

কশাইরা সাধারণত নির্মম হয়; বা উল্টো করে বললে বলতে হয় নির্মম না হলে কেউ কশাই হতে পারে না। জীব হত্যা করতে করতে সে নির্মম হয়ে গেছে। তার চোখ টকটকে লাল। চোয়ালের হাড় উঁচু। নির্মমের সাথে ঘর করতে করতে তাজা মাংসের আষ্টে গন্ধের সাথে থাকতে থাকতে আজ ফুলের গন্ধ তার কাছে বিশ্রী লাগে, বমি আসে।

এই কঠোর কঠিনের মাঝে তার জীবন চলে। স্ত্রী গাধুলির সাথেও সামান্যতম কথাতেও এই কঠোরতা প্রকাশ পায়। নানকু যখন কাক ডাকা ভোরে উঠে দোকানের উদ্দেশ্যে বেড়চ্ছে তখন স্ত্রী গাধুলি তাকে জানায় মেয়ে বৃন্দার আমাশা হয়েছে। তাই আসার সময় যাতে একটু

পাঁঠার মেটে নিয়ে আসে। কারণ পাঁঠার মেটে খেলে আমাশা সেরে যাবে। এই স্বাভাবিক সাংসারিক প্রয়োজনের উত্তরে নানকু বলে—নিজের 'মেটে' কেটে দিস। ভারি সুস্বাদ হব খাইতে। আসলে নানকুর নির্মম পেশা তাকে সমস্ত কিছু থেকেই নির্মম করে তুলেছে। হয়তো সে নির্মমতা বাড়িয়ে তুলেছে আর্থিক দৈনযতা। কারণ আর্থিক অনটনের সংসারে মনের অনটনও ঘটতে থাকে তীব্র ভাবে। পাঁচ ছেলেমেয়ের বোঝা নানকুকে বইতে হয় তার ঐ পেশাটুকুকে সম্বল করে। বাড়িতে স্থানিক সঙ্কুলান ও তথৈবচ। রাতে ঘুমটুকুও সে শান্তিতে ঘুমাতে পারে না। সব মিলিয়ে তার জীবন কঠোর, নির্মম হয়ে উঠেছে। সেই কারণে সেদিন এক খরিদ্দার পাঁঠার মেটে কিনতে চাইলে সবটুকু মেটে নানকু বিক্রি করে দেয় সন্তানের আমাশার কথা মনে পড়লেও।

কিন্তু প্রেম কঠিন কঠোর শিলাকেও গলিয়ে দিতে পারে। নানকুও সেই দাম্পত্য প্রেমে ঘায়েল হতে বাধ্য হয়েছিল। একদিন রাতে স্ত্রী গাধুলির সাথে প্রচণ্ড ঝগড়া বেঁধেছিল তার। কিন্তু রাতে গাধুলি নানকুর উপর স্ত্রী স্নেহ ঢেলে দিয়ে নারী সুলভ রায়না ধরে তাকেও জমাদারের বউয়ের মতন একটা রুপোর হাসুলি কিনে দিতে হবে। অণুনয়টুকু করেছিল নানকুর কাছে। তাতেই আঁতকে ওঠে নানকু। কনুই দিয়ে প্রেম বর্ষিতা স্ত্রীকে এমন সজোড়ে আঘাত করে যে গাধুলি বিকট শব্দে কেঁদে ওঠে। আর তারপর চলল ওর (গাধুলির) বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে-কেঁদে গালিগালাজ। মাঝে মাঝে নানকুর আস্ফালন। শেষ পর্যন্ত নানকু উঠে গাধুলির চুলের গোছা ধরে টেনে ওর থলথলে মাংসল গালে নিজের সরু লিকলিকে আঙুলগুলোর দাগ বসিয়ে দিল। রাগান্বিত নানকু বিছানা ছেড়ে চলে যায় দোকানে। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল দোকানে উঁকি মারা কুকুরটার উপর। ছুড়ি দিয়ে ঢিল ছুড়ে ক্ষতস্থান করে দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পড়ে নানকু দেখে কুকুরের সাথে থাকা পাগলটি কচুর রস আপন মুখে চুসে ঢেলে দিচ্ছে কুকুরের ক্ষতস্থান নিরাময়ের জন্য। এই অপার্থিব প্রেম দেখে পাষাণ নানকু কাহার আর কশাই নানকু থাকতে পারে নি। অনুশোচনা দেখা দেয় নানকুর হৃদয়ে গাধুলির জন্য। নানকু ভাবল, কাল রাতে গাধুলিকে শুধু শুধু মারতে গেল কেন? কোনই তো দোষ করেনি ও, কতই বা বয়স হবে। ভেতরে ভেতরে অনুতপ্ত নানকু আত্ম যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে। ভাবতে থাকে তার পেশাটাই এত নির্মম স্ত্রীর প্রেম তাকে বুঝতে দিল যে

পাঁঠা কাটতে কাটতে কশাই-ই হয়ে গেছে নানকু। যেখানে সমস্ত ভালোবাসাকেও নানকু জবাই করতে পিছপা হচ্ছে না। শেষে নানকু কশাই নানকু থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ করে নেয় স্ত্রীর প্রেমের কাছে। পরাজিত নানকু সেদিন যেন বিজয়ী সম্রাট।

গল্পটিতে নিম্নবিত্ত, নিম্নবর্গীয় মানুষের দাম্পত্য জীবন এবং প্রেমকে এক আজলায় তুলে এনেছেন লেখক।

দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ডে স্থান পাওয়া 'অসুখ' গল্পটিতে দাম্পত্য জীবনের এক নতুন দিক উদ্ভাসিত হয়ে আছে। আসলে দেবেশ রায় তাঁর পূর্বসূরী পরিকল্পিত প্রথাগত দাম্পত্যকে ছেড়ে পুরাতন গেলাসে যেন তার সময়কার আধুনিক জটিল জীবন এবং ব্যক্তিত্বের কথা শোনালেন। দাম্পত্যের আঁধারে লেখকের চিন্তার, বিবেচনার ক্ষুরধার জীবনবোধগুলি নানাভাবে উঠে এসেছে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে। 'অসুখ' গল্পে দাম্পত্য জীবনের এমনই এক অনন্য দিক তুলে ধরেছেন অনুরাধা এবং অবিনাশকে আশ্রয় করে।

অনুরাধা অতি আদরে মানুষ। তার গড়নটি যেন মোমের পুতুলের মত নরম। একটু আঘাতেই তার শরীরের রক্ত মাংসে দাগ পড়ে যায় যেন। তার শরীরে একটা রোগও আছে। আনন্দ বা খুশি তার মনের ভেতরে বইতে থাকলে শরীরের নানান নরম স্থান ফুলে যায়। অনেকটা পিঁপড়ে কামড়ার মতো। তাই অনু নিজের মনকে বোঝার জন্য শরীরের এইসব লক্ষণের উপর নির্ভর করে। তার শরীর যদি ওরকম ভাব নিয়ে আসে তাহলে সে নিশ্চিত হয়ে যায় যে তার মন খুশিতে ভরে উঠেছে। এই রোগের চিকিৎসা করাও হয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার একসময় সেটাকে পাত্তা না দিয়ে জানিয়ে দেয় বিয়ের পর সেটা ঠিক হয়ে যাবে। সতের বছরের কোঠায় তার বিয়ে হল অবিনাশের সাথে। বিয়ের দিন তার ঐরকম পিঁপড়ে কামরানোর মত হয়েছিল, গালে, কানে, পায়ে। সে নিজেকে বুঝতে পারে সে খুশিতে আছে। আনন্দে আছে। কিন্তু অন্তর্চেতনায় তার ভেতরে এই খুশির আড়ালে একটা অনিকেত নির্মমতাও যেন ফুটে উঠে। সমস্ত এয়োতিরা যখন তাকে তাদের কড় কড়ে হাতগুলো দিয়ে কনে সাজানোর দিকে ঠেলছে, অর্থাৎ নূতন বউ হওয়ার দিকে ঠেলছে, তার মনে হয়েছে তাকে পুরনো। ঐসব পুরাতন এয়োতিদের অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য তাকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। কারণ নূতনকে পুরাতন হতেই হবে একসময়। তবুও অনুরাধা সেদিন খুশি ছিল, তার

শরীর তাকে জানান দিয়েছে।

অনুরাধার বিয়ে হবার পর স্বামীর সাথে ঘর করছে। অবিনাশ অফিসে চলে যাবার পর সে একাই থাকে। স্বামী-স্ত্রীতে দু'জনের সংসার। স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন। অফিস থেকে ফিরে এলে স্বামীর যথাসম্ভব আহার আপ্যায়ণের ব্যবস্থা অফিসে যাবার বেলায় সব কিছু গুছিয়ে দেওয়া সবই ঠিক চলেছে। কিন্তু অনুরাধার সেই শরীর আর কোন সাড়া দেয় না। আত্মঅন্বেষণে অনুরাধা অধীর।

দুপুরবেলা অবিনাশ অফিস থেকে এসে খেয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর অবিনাশ আর অনুরাধা যখন নস্যিকে নিয়ে অন্তরঙ্গ খুনসুটি করছে তখনও অবনির স্পর্শে তার ভালো লেগেছিল। কিন্তু অবনির নস্যি নেওয়া নাক, রোমশ শরীর, ময়লা জিভ, দাদের অপর পিঠের নোংরা তার গা গুলিয়ে দিয়েছিল। ঘেন্নায় তার বিতৃষ্ণা আসে। কারণ অনুরাধার এই শুচিবাই জন্মগত। কিন্তু তবুও তো দাম্পত্যের শরীরের স্পর্শের সুখ সে পেয়েছিল। তবে শরীর আর আগের মতো সাড়া দেয় না কেন তাহলে? নাকি অনুরাধা আসলে অবিনাশকে ভালো বাসতে পারেনি। ভালো যদি না বাসতো তাহলে স্বামীর সাথে দাম্পত্যের লীলা সে করতে পারতো না। রাতেও অবিনাশের স্পর্শে সে উদ্দাম হয়ে ওঠে, অবিনাশকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলে, খেয়াল রাখে অবিনাশের। কিন্তু কোথায় যেন একটা খামতি থেকে যায় যাতে করে অনুরাধার শরীর সায় দেয় না।

আসলে দাম্পত্যের মানিয়ে নেওয়া, সমঝোতা করার মতো জটিল জীবনে অভ্যস্ত হতে পারেনি অনুরাধা বাবা মায়ের ধরিয়ে দেওয়া দেখিয়ে দেওয়া রাস্তায় চলতে চলতে অনুরাধার কাছে পৃথিবীর পরিসর বাড়তে পারেনি। তাছাড়াও অবিনাশের জন্মগত শরীর, লোমশ পেট, গাল পাট্টা এবং নস্যির নেশা অনুরাধার জনগত শূচিতা বাঁধা দিয়েছে দাম্পত্যের নীল আকাশে পাখনা মেলে দিতে। সরু আলপথ ধরে মেপে মেপে চলায় অনুরাধা তার কল্পিত আনন্দটা হয়তো হারিয়ে ফেলেছে। নিজের মত করে সবটা সাজিয়ে নিতে না পেরে অ-সুখে ভুগেছে, নিজের কথাটুকু নিজের ভালোলাগা মন্দ লাগাটাকে দেখেছে, তেমনি অবিনাশও সেই গণ্ডীর বাইরে বেরতে পারে নি। নিজের টুকুতেই সেও সন্তুষ্ট ছিল হয়তো। তাই অনুরাধা তাকে ভালোবাসে কিনা—এই দোলাচলে নিমজ্জিত হয়েছে দাম্পত্যের অটুট

বন্ধনের মাঝেও। অনুরাধা যেদিন তার অশৈশব লালিত ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দ লাগা না ছাড়বে, ততদিন পর্যন্ত সে অবিনাশের গিন্নি হতে পারবে না। আবার দাম্পত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আপন ব্যক্তিত্ব বিসর্জন না দিলে মিটবে না। বলা ভালো নিজেকে অন্তর থেকে বিলীন করে না দিলে অনুরাধার দাম্পত্যের অসুখ মিটবে না।

প্রথাগত দাম্পত্য জীবন থেকে অবিনাশ আর অনুরাধার দাম্পত্য জীবন চিন্তা ও চেতনায় কিছুটা দূরবর্তী। দেবেশ রায়ের আধুনিক, জটিল জীবন জিজ্ঞাসা তার অনেক চরিত্রের ভেতর যেমন আমরা দেখতে পাই, তেমনি বিশেষত অনুরাধা চরিত্রটি তারই জটিল জিজ্ঞাসায় আবিষ্ট। আসলে এই দাম্পত্য সম্পর্কের আবহে লেখক অনুরাধার মধ্য দিয়ে নারী মনস্তত্বের এক অনালোকিত দিক উন্মোচিত করেছেন। এখানে সময়ও একটা চিন্তা চেতনাকে সামনে দাঁড় করিয়েছিল। দাম্পত্যজীবন নামক সমাজ নির্দিষ্ট বিধি ব্যবস্থাটি অনুরাধাকে আপন স্রোতে টানছে কিন্তু অনুরাধা ব্যক্তিত্বের জায়গাটুকু ছাড়তে না পেরে তারই মানদণ্ডে বিচার করতে চেয়েছে অবিনাশকে। এবং তাই অনুরাধা এখনো অবিনাশের স্ত্রী হতে এখনও বাকি আছে বলে মনে হয়।

প্রচলিত দাম্পত্য জীবনের পরিবর্তে তার গল্পের যেখানে দাম্পত্য সম্পর্কের কথা এসেছে তাতে দেখা গেছে আমাদের চিরাচরিত দেখে আসা, অভিজ্ঞতা-লব্ধ দাম্পত্যজীবন তার হাত ধরে কেমন করে যেন বদলে যাচ্ছে। দেখা দিচ্ছে তাতে নতুন নতুন প্রশ্ন, ভাবনা এবং ভাবধারার সম্মিলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অবিশ্বাস, চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা, ব্যাক্তিক চেতনার পরিবর্তনের ফল হয়তো তার মন এবং মননকে এমনভাবেই সংক্রমিত করেছে। চারপাশের প্রথাগত সমাজ এবং ব্যক্তি মানুষের নানান ধারণাগত পরিবর্তন তিনি লেখনীতে ধারণ করে বাঙ্ময় করে তুলেছেন মানুষের অন্তরের এক নতুন অনালোকিত দিক যা অনুভবে হয়তো এতদিন ছিল কিংবা বলা যেতে পারে সমকালীন বাস্তবতা হয়তো তাকে নানান জটিল প্রশ্ন চিহ্নের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাই গল্পের চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক পূর্ব সমাজ নির্দিষ্ট হলেও চিন্তা এবং চেতনাগুলো কেমন যেন নূতন অচনা এবং বিস্ময়কর। যা এতদিন অবচেতনে ছিল প্রকাশের সৎসাহস না পেয়ে গুমরে গুমরে কেঁদে মরেছিল চেতনার অন্তরালে, আজ তার বন্ধন মুক্তি ঘটিয়ে মেলে ধরা হচ্ছে সমাজের

সামনে নানান ভঙ্গিমায়।

দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত 'স্মৃতিজীবী' গল্পটিতে এমনই এক দাম্পত্য জীবনের কথা লিপিবদ্ধ আছে যার কোন সামাজিক বা অর্থনৈতিক কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, অভাব অনটনের কথা সেখানে অনুপস্থিত। পরস্পরের প্রতি অপছন্দেরও কোন ব্যাপার সেখানে নেই তবুও কোন এক চেতনায় সেই দাম্পত্য জীবন কোথায় যেন অসন্তুষ্ট, কোথায় যেন একটা অদৃশ্য ফাঁক রয়ে গেছে। তারা বর্তমানকে নিয়ে সুখী নয়, হতে পারেনি।

গল্পটিতে অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে দাম্পত্য জীবনের সাধারণ কথা। যাতে করে একটি স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক জীবন যাপনের অনুসারী ছবি ফুটে উঠেছে। দত্ত এবং অরুণার সংসার। দত্ত একসময় মেসে থাকত। সেই মেসের বন্ধুদের সাথে স্ত্রীসহ সিনেমা দেখতে যাওয়ার একটা চিত্র রয়েছে। বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়া করে বিছানায় যাওয়া সে সময় দু-চারটি সাধারণ কথাবার্তা। বিয়ের সময় প্রথম পরিচয়ে বল্লভ কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল তা নিয়ে হাসাহাসি ইত্যাদি। করুণা চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। দত্ত বাড়ির কাজের জন্য একজন লোক রাখতে চায় এখনি। কিন্তু তাতে বাঁধা দান করে করুণা। তার দাবি, আরও কিছুদিন যাক তার পরে কাজের লোক নিয়োগ করলে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু দত্তর আশঙ্কা যায় না। করুণাকে অভিযোগ করে বলে, এই বেশি বাড়াবাড়ির ফলে যদি বাচ্চার ক্ষতি হয় তাহলে সেই ক্ষতিটা মারাত্মক ক্ষতি হবে, সেখানে একমাস কাজের লোক রাখলে টাকা-পয়সার যা ক্ষতি হবে তার ধারে কাছেও নয়। বিছানায় শুয়ে দত্তের আদর নেওয়া থেকে সব কিছু স্বাভাবিক। কিন্তু মনের অন্দরমহল তখন এক গভীর অসুখের ভাবনায় মত্ত। দু'জন দু'জনের কাছে সুখের অনুভূতি পেয়েও তারা যেন অসুখী, এই জীবন তাদের আনন্দের নয়।

করুণা দাম্পত্যের এই ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি পেতে চায়, ফিরে যেতে চায় তার ঝরেপড়া শৈশবে, কৈশোর যৌবনে কুমারীত্বে। ষোল-সতের বছরের জীবনও ছিল সুখে-দুঃখে, আলোয়-আঁধারে মেশানো। তবুও সে দুঃখ যেন আজকের কোন সুখের থেকে বেশি আপন। কুমারী জীবনের স্বপ্ন, আশাকাঙক্ষার দোলাচলতা, স্বপ্নে বিভোর দুটি চোখ স্বপ্নকে বাস্তবের মাটিতে পাওয়ার তৃষ্ণা এবং ভবিষ্যতের মাপকাঠিতে রেখে আবার বয়ে যাওয়া

হাসি-কান্নার দোলাচল বৃত্তি আজ কত আকাঙ্ক্ষিত বলে মনে হয়। তাই মাতৃত্বের স্বাদ পেতে চলা কোন তথাকথিত নারীর মতো সে সুখী নয়। সে যে নিষ্ঠুর তা কিন্তু নয়। আপন গর্ভে যে সন্তান দিনের পর দিন পরিপুষ্ট লাভ করে বেড়ে উঠছে তার প্রতি অনাদর নেই। কিন্তু হারানো যৌবন এবং তার উদ্দাম উন্মত্ত উজ্জ্বলতা একটা গভীর নষ্টালজিক ছায়া ফেলে করুণার উপর। অনিবার্য কুমারীত্ব হারানো, দাম্পত্যে আবদ্ধ, স্বামীর অন্ধশায়িনী হয়েও সেই নষ্টালজিয়ায় সে ডুবে যায়, তলিয়ে যায়। তার কথায়—''সেই অন্ধকারের নির্জন ষোল-সতের বছরের রাতগুলো বেদনায় ও যন্ত্রণায় অনেক বেশি রঙিন ছিল, অনেক বেশি রঙিন।''[২৮]

দত্তও তেমনি সমান ভাবনায় ভাবিত। একসময় সে মেসে থাকত। অবশ্যই বিবাহের পূর্বে। একসময় সে একটি চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিতে যোগদান করেছে। তা নিয়ে এত ভাবনা চিন্তার কোন জায়গা ছিল না যা আজ তাকে করতে হয়। খবরের কাগজে একটা চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে সেও ফিরে যেতে চেয়েছে তার শৈশব কৈশোরের খেলাঘরে। স্বাভাবিক স্বচ্ছল দাম্পত্য জীবনে থেকেও আজ তার শরীর কি এক অজানা কারণে ভারি হয়ে যায়। একটার পর একটা দিন যাচ্ছে আর এই ভাবের উপর ভার অনবরত পড়ছে এবং সেটাকে ফেলে দেবার কোন উপায় নেই। সে ধীরে ধীরে তলিয়ে দেখতে থাকে তার শৈশবে দিনগুলোকে। একসময় খেলতে খেলতে সন্ধ্যা হয়ে গেলে বাড়ি ফেরার পথে কত ভাবনা, কত উদ্বেগ, কত আশঙ্কা, মা কী বলবেন, বাবা কী বলবেন? আজ সমস্ত আশঙ্কা মুছে গেছে, কী বলবেন -এর সব ভয় শেষ, এত স্বাধীনতা পেয়ে গেছে সে তবুও সেই জীবনটি যেন তার কাছে অমূল্য হয়ে বুকের ভেতরে বাসা বেঁধে আছে। আজও দিনের আলো ফোটে, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয় কিন্তু তার জীবন বদলে গেছে অনেকখানি। শুধু তাই নয়, নিজের জীবনের অতিক্রান্ত জীবনের সেই পুলকের মুহূর্তগুলো ছাড়ায় নিকট অতীতের জীবনটাও আজকের দিনটির বা বর্তমানের থেকে বড় প্রিয় হয়ে উঠেছে। জানলার ধারে করুণাকে যে গর্ভবতী, যার কুমারীত্ব সে নিজের অধিকারে হরণ করেছে তাকেও সে সেই পুরনো তথা সদ্য বিবাহিত কুমারীত্বের অধিকারিণীকে পেতে চাইছে। করুণাকে আজও দেখলে কুমারীর মতোই লাগে। পেছন থেকে আজও সবাই ভাববে, করুণা কলেজের মেয়ে,

বিয়ে হয়নি এখনো। মাথায় সিঁদুর আর হাতের শাঁখাটা ছাড়া ওর শরীরে কোথাও সে বিজ্ঞাপন নেই। চোখে দেখা এই করুণাকে দত্তের ভালো লাগে, এটাই সে পেতে চায়। এই পাওয়ার মধেয তারও কৌমার্যে পৌঁছে যাওয়ার একটা যুক্তি সে খাড়া করতে পারত নিজের সামনে। কিন্তু করুণার বাইরেটা ছেড়ে অন্দরে প্রবেশ করলেই দেখা যায়—সেখানে নির্ভুলভাবে আর-একটা শরীর গঠিত হচ্ছে। সেই তৃতীয় দেহটার ক্রমগঠনে প্রমাণিত হচ্ছে করুণা আর কুমারী নেই। নিজের সেই পুরনো অতীতের আনন্দঘন দিনগুলোতে ফিরে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। সে ভাবে—করুণাকে এখন লাল চেলি আর বেনারসীতে আবার কেমন লাগবে? হয়তো এখন আগের চাইতে ভাল লাগবে, আরো সুন্দর, আরো নয়নমোহন, কেবল থাকবে না সেই কৌমার্যের শান্তি আর প্রতীক্ষা।

দত্ত আর করুণার দাম্পত্য জীবনে সাধারণ অশান্তির বাতাবরণ নেই। দাম্পত্যের কোন কলহ বা ভাবী দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত এখানে দেন নি। তবুও অন্তর্চেতনায় খেলা করার প্রত্যেকটি মানুষের অতীতের প্রতি, পুরাতনের প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ যা পারতপক্ষে কেউ অস্বীকার করতে পারে না, সেই সুতীব্র আকর্ষণকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যার আবর্তে দুটো স্বাভাবিক নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের মাঝখানে দুঃখের চোরা বেদনার চোরা স্রোত বয়ে চলেছে। কোন সুখ দিতে পারবে না দাম্পত্যের আশ্লেষ। করুণা এবং দত্ত শরীরে শরীর মিশিয়ে ফেলার পরেও অসীম বালুচরে একাকীত্ব ঘুরপাক খায়। করুণা নিজেকে দত্তের শরীরে মিশিয়ে দিয়ে দত্তকেই অস্বীকার করতে চায় যেন। ভুলতে চায় তার দাম্পত্য জীবন, ভুলে যেতে চায় অকৌমার্যের বাস্তব রূপ।

শুধু তাই নয়। গল্পটিতে দত্তের কয়েকজন বন্ধুর প্রসঙ্গও এসেছে। যাদের সাথে মেসে একসময় থাকত। সেইসব বন্ধু তথা, বল্লভ, রাও, পরেশ, সুধাময়—এরাও তাদের বর্তমান জীবনে সুখী নয়। তারাও বর্তমান থেকে পিছিয়ে ফিরে যেতে চাইছে অতীতে। অতীতের স্মৃতিমেদুর সেই দিনগুলির স্বপ্নে তারা প্রত্যেকেই বিভোর—সে বিবাহিত হোক আর কলেজ পড়ুয়াই হোক। রবিবারের অলস অকর্মন্য দুপুরে তারা প্রত্যেকে যখন বিছানায় শুয়ে রয়েছে ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু না ঘুমিয়ে বা ঘুমের দেশে যাবার আগে জাগ্রত চৈতন্যে দেখা দিচ্ছে সেই মোহময় দিনগুলি। সিনেমা দেখতে যায় সবাই মিলে সাথে পুরনো

বন্ধু দত্ত এবং তার স্ত্রী করুণা। দত্ত ছাড়া বাকিদের কথাবার্তায় দত্তের কোথায় যেন হাহাকার করে ওঠে। দত্ত ভাবে—কি দিনগুলো কেটেছে। ওদের এখনো আছে, আমার নেই। অর্থাৎ দত্ত বর্তমানে বিবাহিত। আর যেহেতু বর্তমান সবার অসুখীর কারণ তাই অবিবাহিত বন্ধুদের দেখে তার মনের জ্বালা শতগুণে বৃদ্ধি পেয়ে ফুলে ওঠে। সিনেমা দেখতে না আসা সুধাময় নমিতার জন্য হয়তো অপেক্ষারত, ভাবছে বিগতা প্রেমিকা সুজাতার কথা। বর্তমানকে নিয়ে সে ভালো নেই। অথচ ভালো না থাকার ভারি কারণও নেই। নমিতার সাথে তার দেখা হয়েছে। জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছে। যতটা প্রেমের পরকাষ্ঠা দেখানো উচিৎ ততটাই নমিতার রয়েছে তবুও স্মৃতির মত কোমল, শ্যামল আবছা হয়ে সুজাতা দাঁড়িয়ে থাকে।

ছোটবেলার ফেলে আসা দিনগুলির মত রাও আজও কল্পনায় মাদুরা মন্দিরের দেবদাসীর মূর্তিটিকে নাচতে বলছে। বল্লভ কৈশোরের দূরন্তপনার স্বপ্নে বিভোর হয়ে কখনো গরিলার মত দাঁত বের করছে, কখনো ধান গাছের মত উড়ছে। রবিও চেতন অচেতনের মাঝে দাঁড়িয়ে নিজের অতীতকে ছুতে চাইছে যেমন করে ছুটন্ত ঘোরার পেছনে তার মালিক ছুটে যায় ধরার জন্য অথচ ধরতে পারে না।

বস্তুত লেখক দাম্পত্য জীবনকে সামনে রেখে মানব জীবনের প্রত্যেকটা ধাপের বর্তমানকে অস্বীকার করে অতীতের প্রতি যে টান, তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'স্মৃতিজীবী' গল্পে। মানুষ অতীতকে ভালোবাসে। এই চির সত্যটি তিনি তুলে ধরেছেন এখানে। পুরাতনের স্মৃতি বর্তমানকে সুখী-অসুখী করে তোলে। যে বর্তমানকে মানুষ অসুখী ভেবে দুঃখী হয়, সেই বর্তমানটি একসময় অতীতের রূপ ধারণ করলে তাকেই তখন কোমল মনে হয়, মূল্যবান মনে হয়।

পরিশেষে বলা যায় দেবেশ রায় যে সময়ে দাঁড়িয়ে তার গল্পগুলির বিন্যাস ঘটাচ্ছেন সেই সময়টা সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং চেতনার ও মূল্যবোধের ভাঙনের কাল। সেই সময়ে দেবেশ রায় সচেতন মনে নিপাট দাম্পত্য জীবন কলহ, তথাকথিত পুরাতন সামাজিক বন্ধনে দাম্পত্যের টানাপোড়েনকে হয়তো আঁকতে চান নি, সেই কালও বিগত অতীত। তাই তাঁর প্রত্যেকটি দাম্পত্য জীবনমূলক গল্পে দাম্পত্যের অন্তরালে নব নব চেতনা, ব্যক্তিত্বের নব উন্মোচন এবং জীবনের স্বার্থকতার নানান দিক তুলে ধরেছেন। হাসি কান্নার আধার তার

আঁকা দাম্পত্য জীবনে স্থান পায়নি। চেতনার গভীরে থাকা বিচিত্র রং যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, তাই-ই তাঁর সেই সব গল্পের আধার হয়ে গেছে। তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে নবতর জীবনবেদ। শুধু গল্পের কাঠামোতে নয়, জীবনচর্যার অন্তর্লোকে প্রবেশ করে তিনি তুলে এনেছেন অচেনা, অজানা জীবনের অন্তর রূপ।

চ. নৈতিকচেতনার হ্রাস, মূল্যবোধহীনতা ও হতাশার গল্প :

প্রকৃত গল্পকারের চরিত্র একটি নির্দিষ্ট স্থির অবয়বে ধরা পড়ে তাঁর ধ্রুপদী ভাষ্যের আলোক বিচ্ছুরণে। সেখানে বোধহয় কোনো শর্তই শর্ত হয়ে ওঠে না। গল্প বলার ছলে ঘটনা শরীরী আকার ধারণ করে। কখনও ঘটনাই হয়ে পড়ে ছদ্মবেশের আরেক আশ্রয় গল্প। আলোচনার চতুর্থ অধ্যায়ে এসে এখন মনে হয় গল্পকার দেবেশ সম্পর্কে কোনো বাধাধরা গণ্ডী অর্থহীন সমুতুল্য। তাঁর গল্পকার সত্তার চরিত্র তরতাজা তরল জলের মতোই স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। পবিত্র সাদা রঙের একটি ধ্যানী মেজাজে তাঁর চলমানতার দিনলিপি প্রতিনিয়ত বয়ে চলে। তরতাজা তরল জলের ধরণ সময় ভেদে যে পাত্রে যেমন আকার নিতে হয় দেবেশ রায় তাঁর গল্পকার সত্তার চূড়ান্ত গভীরে সেই আকারই ধারণ করেন। এবং পবিত্র সাদা রঙের একটি ধ্যানী মেজাজ হুবহুভাবে ধারণ করে নিতে জানে সময়োপযোগী একটি বিশেষ রঙ। মনস্তত্ত্বমূলক ছোটগল্পের দিনগুলিতে দেখেছি তাঁর কিছু পরিচয়, আবার রাজনৈতিক বাতাবরণমূলক ছোটগল্প অতিক্রম করে সমাজচেতনামূলক, অর্থনৈতিক সংকটমূলক স্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিজেকে না থামিয়ে নৈতিক চেতনার অবক্ষয়, মূল্যবোধহীনতায় গল্পকার দেবেশকে নতুন করে আবিষ্কার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে।

একজন রচয়িতার মধ্যে যখন ছোটগল্পকার সত্তা এবং উপন্যাসিক সত্তা দু'টোই উপস্থিত থাকে তখন সেই রচয়িতার রচনার ভাবধারার নির্মাণও একটু আলাদা ধরণের হয়ে থাকে। ছোটগল্প নির্মাণে। যে সব প্রাথমিক শর্ত প্রচলিত রয়েছে তার গতিপথ ধরে এগোলে দেখব দেবেশ রায় এক নতুন গতিপথে বিচরণ করে এসেছেন। গল্প বিষয় নির্মাণে প্রচলিত ছকের দিকে মুখ না ফিরিয়ে তিনি পাড়ি দিয়েছেন ভিন্ন দিকে। গল্পের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নিয়ে কোনো

আইনকে তিনি আইন বলে মানেন নি। এখনও পর্যন্ত নিয়লসভাবে তিনি হেঁটে চলেছেন তাঁর বিছানো পথের গন্তব্যে।

গল্পকার দেবেশ রায়ের বিবিধ রূপ ও স্বরূপের সম্পর্কে আলোচনার পর গল্পে নৈতিকচেতনার অবক্ষয়, মূল্যবোধহীনতার অন্ধকারে চলা কিছু হতাশার গল্প নিয়ে এবার আলোচনা করা দরকার। বাংলায় গল্প ষাটের দশকে পৌঁছে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে লক্ষ্য করেছি নরনারীর দেহকে কেন্দ্র করে দেশজ প্রেম-কামনা, দেহকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বমূলক বিষয়, প্রেম-ভালোবাসার নানা স্তর খণ্ডনের বৃত্তান্ত। সাহিত্যের সম্ভারে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল সাহিত্যকে খণ্ডন করার কেন্দ্র হিসাবে সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপ গড়ার ব্যস্ততা এখানে উল্লেখযোগ্য ভাবে নির্মিত হয়ে উঠছিল। অন্যদিকে ছোটগল্পের প্রবাহ বিচরণ করছিল সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। এই ধারার অবলম্বনে দেহকেন্দ্রিক বিষয় নেই, নেই প্রেম-রোমান্সের ছড়াছড়ি। রয়েছে সম্পূর্ণ মানবের মন-মনন জুড়ে ঘটে চলা জীবনের ঘটনা। প্রতিযোগিতা, প্রবৃত্তি, লড়াই, ব্যর্থতা, মূল্যবোধহীনতা ও হতাশাময় জীবনের গল্প। খুব স্বভাবতই এখানে গল্পের নতুন মেজাজ তৈরি হল। ফলে গল্পের বিষয়-বস্তুতে আসতে শুরু করল বন্দী জীবনের হতাশার ছাড়ায় মুক্তির ধ্বনি, জীবনের বিষয় অভিজ্ঞতা দানা বাধল, মানুষ সভ্যতার এক নতুন বিন্যাস শিল্পের ও সমাজের অন্দরে প্রবেশ করে দেখার দর্শন উঠে এল এমন কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। দেবেশ রায় এই ধারার বাতাবরণে নিজেকে নতুন করে তুলে ধরলেন। স্বাভাবিকতা ক্ষয়ের দুঃসময় তাঁকে এসময় বলে করতে হয়েছে। নৈতিকচেতনায় মানুষের অধঃপতন, মূল্যবোধে মানবিক গঠনের ক্ষয় এবং সেখান থেকে আশা-নিরাশার অন্ধকার এক পৃথিবী ধরা দেয় তাঁর গল্পে।

সমাজের বুকে বাস করে সমাজ শিখিয়ে দেয় অনেক বিষয়। সেই বিষয়ের ভিতরে জমানো থাকে অনেক না বলা কথা। সবাই কি আর সবকিছু দেখতে পান সব দেখতে পেয়েও নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনার গড় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজের ভাল-খারাপের একটা চিত্র আমরা দেখতে অভ্যস্ত। এর বাইরে আমাদের আর বলার কিছু থাকে না। দেবেশ রায় এই গড় দৃষ্টিভঙ্গির বেরা টপকে দেখতে পান সমাজ-সভ্যতার একটি সম্পূর্ণ ভূগোল। তাঁর মতে,

''আমাদের আস্তিক্যের বনিয়াদ ধসে গেছে। বিশ্বাস বদল করে মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষ বিশ্বাস বদল করে বাঁচেও না। তৃতীয় বিশ্বের একটি বড় দেশে প্রায় একশ কোটি মানুষের মধ্যে বাঁচার অধিকারে মানুষের ওপর, মানুষের সমাবেশের ওপর, সমবেত বিদ্রোহের ওপর, চৈতন্যের উন্মেষের ওপর, মানবসত্তার জাগরণের ওপর অনন্যোপায় নির্ভরতা ছাড়া আমার, বা আমার মত অনেকেরই আর কোনো অবলম্বন নেই। সেই অবলম্বনই লেখায়, বাঁচায়। সেই অবলম্বনটুকু নিয়েই লিখিব, বাঁচব। এটাও কেবল আশাই, যে আশা ছাড়া জীবনধারণ করা যায় না। যতটুকু জীবৎকালই অবশিষ্ট থাকুক না কেন এই আশাটুকু ছাড়া সেটুকুও পাড়ি দেওয়া যাবে না।''[২৯]

নৈতিক পতনের পূর্বাভাস বা ঘটে যাওয়া দিনযাপনের কথাই তাঁর মুখে স্পষ্টভাবে শোনা যায়। অবক্ষয় সমাজে কোনো কালেই বোধহয় থেমে ছিল না। কাল ভেদে তার রূপান্তর ঘটেছে মাত্র। বর্তমান পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখে গল্পকার দেবেশের দৃষ্টি খুব সচেতনভাবে পড়েছে। নৈতিক চেতনার মানবিক অবক্ষয়ের চিত্র থেকে মূল্যবোধের ভাঙন বা হতাশায় তলিয়ে যাওয়া জীবনের গল্প অঙ্কণ করেছেন তিনি জীবনের কাছাকাছি পৌঁছে। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পে এমন অবস্থার চিত্র পড়েছে অত্যন্ত মানবিক দক্ষতার সাথে।

'জীবনানন্দের মুখ' গল্পে আধুনিক সভ্যতায় আশ্চর্য উপহার দূরদর্শনের নিত্য প্রয়োজনীয় বিনোদনের আধারে ঢুবে পড়া মানবিক চেতনার স্বাভাবিক গতিপথের অনুকূলে অস্বাভাবিক জীবনযাপনেরই হদিশ দিয়েছেন গল্পকার। নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা যেন রক্তের সাথে মিশিয়ে ফেলেছে এই আধুনিক মাধ্যমটিকে। তাঁদের দিনযাপনের শৈলীতে ঘুরে ফিরে কোথাও যেন দূরদর্শনের প্রভাব আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞাপনের নানারকম রূপে নতুন প্রজন্ম ডুবে থাকে সর্বদা। ভাল-খারাপের দিকগুলি নির্ণয় না করে আসলে নির্ণয় না করতে পারার বোধহীন ভাবনায় বিজ্ঞাপনের ক্ষতিকর খপ্পরে পড়তে থাকে। ভুলে যায় নৈতিক চেতনার ফারাক। সর্বনাশগ্রস্ত হয়ে সমাজে এরা সমাজে বিছিয়ে দেয় মূল্যবোধহীনতায় বিবিধ দিক। 'জীবনানন্দের মুখ' গল্পটি আসলে মানবিকতার ধ্বজা উড়িয়ে আধুনিক সভ্যতার

ভয়াবহ রূপকে তুলে ধরে।

দুজোঁ, গোপা, আনন্দ এমন এক সমাজ-সভ্যতায় বেড়ে ওঠে যেখানে ঘরের চার দেওয়াল সময় অতিবাহনের একটি বড় জায়গা। তাদের চোখের সামনে জীবনগঠনের অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ থাকলেও গল্পকারের চোখে ধরা পড়ে একটি অর্থহীন জীবনযাপনের পর্ব। দেখতে পাই, টিভিতে বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন হয়ে যাচ্ছিল তিনজনের কেউই দেখছিল না। কিন্তু টিভির আলোর এই তিনজনের মধ্যে বদলে বদলে যাচ্ছিল। এই ক্ষুদ্র বর্ণনাতেই ধরা পড়ে তাদের পরস্পরের ভয়াবহ চিত্র। পরিবারের সবাই দূরদর্শনের হকের দৃশয দেখতে দেখতে মনের অগোচরে যান্ত্রিকতায় পরিণত হয়ে যায়। তাঁদের রুচিবোধ কোথাও হারিয়ে যায়। দূরদর্শনের পর্দা ধীরে ধীরে গ্রাস করে তাদের মন-মানসিকতা। গল্পকার দেবেশ ভয়াবহ চিত্রের পূর্বাভাস তুলে ধরেছেন নিপুণভাবে। চিত্রটি এরকম,

> ''প্রতিদিন দেখা এ-দৃশ্যটা প্রতিদিনের প্রতীক্ষা নিয়েই ওরা দেখে, প্রত্যাশার একই পরিচিত ওঠাপড়ার উদ্বেগ নিয়ে দেখে মধ্য চল্লিশের মা, মধ্য কুড়ির মেয়ে ও এখনও টিন-এজার না-হওয়ার ছেলে। তারপরই একটা সিনেমার দৃশ্যের মত দৃশ্য বহু পুরনো দিনের রাস্তার মতো রাস্তা, ঘোড়ার গাড়ি, মনে হয় প্রাচীন কোনো ফোটোগ্রাফ, একটি অত্যন্ত নবীন ছেলে অত্যন্ত আধুনিক পোশাকে পর্দার ডানদিকের তলার পর্দা জুড়ে। তার কোনোকোনি বাঁদিকের ওপরের দিকে আবছা পটভূমিকায় একটি সম্পূর্ণ মেয়ে দাঁড়িয়ে।''[৩০]

দেখতে পাই মা-দিদির বকুনি খেয়েও দুজোঁ টিভি বন্ধ না করার কথা সরাসরি জানিয়ে দেয়। আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না এই ছোট্ট শিশুটির মস্তিষ্ক কীভাবে গ্রাস করেছে। একটি পরিবারের এই ছবিতে সহস্র পরিবারের স্বরূপ যেন ভেসে ওঠে। টিভির বিভিন্ন পর্বগুলি কখন কোন সময় দেখতে হবে তা মানুষের কাছে যেন একটি জরুরি তাগিদের আকার নিয়েছে। দুজোঁর মা-বাবা তাই দুজোঁকে ডেকে নেন দুজোঁর সবসময় দেখা প্রোগ্রাম। আনন্দর জানা আছে, কখন কী প্রোগ্রাম। সেটা এসে দেখে চলে যায়। দুজোঁর অতটা মনে থাকে না কিন্তু গোপা বা অরিন্দমাবাবু জানেন, কোনটা দুজোঁ দেখে খোন থেকেই তাকে

ডাকেন।[৩১]

এরপর গল্পকার বিজ্ঞাপন জগতের অন্দরে নিয়ে গিয়ে তুলে ধরেন সবচেয়ে মনুষ্যত্বহীনতার তীব্র দিকটি। একজন কবি কবিতার আরাধনা করে কবিতা নির্মাণে জীবন বিসর্জন করেন। সেখানে কবিতাই তার ধ্যান-জ্ঞানের পরিধি। সমাজের অজস্র দিকগুলিকে তিনি আপন কল্পনায় এঁকে রূপ দেন তার স্বরচিত কবিতায়। তাঁর বেদনা, তাঁর যন্ত্রণা সঁপে দেন কবিতার মানসিকতায়। এবং সেই কবি যদি জীবনানন্দ তাহলে কবিতার আরাধনা আরও বেশি সার্থক। সভ্যতার নতুন নতুন উপহারে ধ্রুপদী নির্মাণের অপব্যবহার এখানে চমৎকারভাবে আছ পড়েছে। গল্পে দেখা যায় একটি লোক্যাল ডিটারজেন্ট কোম্পানির জন্য বিজ্ঞাপন তৈরির প্রয়োজনে জীবনানন্দের কবিতার ব্যবহার বৃত্তান্ত। শুভম এসে বলল ওরা একটা লোক্যাল ডিটারজেন্ট কোম্পানিকে বোধহয় বুঝিয়েছে, টিভিতে বিজ্ঞাপন দিলেই 'নিরমা'র মত বিক্রি বেড়ে যাবে। সে একটা ছোট বিজ্ঞাপন দেবে। শুভমরা বন্ধুবান্ধব মিলে করছে। আমাকে কী সব বোঝাল জীবনানন্দের কবিতা দিয়ে ডিটারজেন্টের বিজ্ঞাপন করবে। সেই কবিতাটার সঙ্গে নাকি বাবলির মুখ মিলবে ভাল। জীবনানন্দের কবিতা দিয়ে শেষ পর্যন্ত কাপড় ধোয়ার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। গল্পকার এই নির্মম সময়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। নীতিবোধের প্রখর অধঃপতনের ঘটনাকে তুলে ধরতে একবারও পিছপা হননি তিনি। সময় শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক বিপর্যয়ে আটকে নেই তার বিপর্যয়ের মাত্রা ছাড়িয়ে আজ পৌঁছে গেছে নৈতিক চেতনার স্তরেও। আসলে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বদলে যাচ্ছে সময়ের ভাষা। মানুষের স্বাভাবিকতার গতিপথ ক্ষয় হতে হতে অস্বাভাবিকতার পথে তাদের নিয়ত যাত্রা নিয়ে যাচ্ছে এক অন্ধকার পৃথিবীতে। বিজ্ঞাপন, দূরদর্শনের অপকারিতা নিয়ে ভাবা হয়েছে অনেক, কিন্তু বিজ্ঞাপনের সর্বনাশী রূপ যে দিন দিন নানারূপে থাবা বসাচ্ছে-এ গল্প না পড়লে স্পষ্ট ধারণা থেকে দূরে অবস্থান করা হয়। জীবনানন্দের কবিতাকে আরাধনা না করে কবিতাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া প্রসঙ্গ 'জীবনানন্দের মুখ' গল্পটিকে মূল্যবোধহীনতার পরিচয়ে নিয়ে যায়।

গল্প রচনার প্রচলিত ধারণাকে চূড়ান্তভাবে পরিবর্তনের পন্থা নিয়ে অন্যান্য গল্পকারদের মতো দেবেশ রায়ও হাজির হয়েছিলেন বাংলা ছোটগল্পে একটি বিশেষ সময়ে। পঞ্চাশের

দশকের মধ্য গগনে দেবেশ রায় যখন এলেন তখন বাংলা ছোটগল্প সাবালক অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছে। জীবনের প্রথম দিকে যে গল্প আন্দোলনে নতুন ধরণের ভিন্ন ভিন্ন গল্প নতুন অবতারে উপস্থিত হচ্ছিল গল্পকার দেবেশ তা গ্রহণ করে সময়ের স্রোতে পরবর্তীকালে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পেরেছেন। 'জোত জমি' গল্পটির মধ্যে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যক্তিজীবনকে নিজস্ব অনুভূতির ভাঙন আলোচ্য গল্পে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কণ করা হয়েছে।

ব্যক্তির নিজস্ব আবেগের অবস্থান থেকে নিয়ম বা আইনের রূপগুলো এখানে অবয়ব হিসাবে উঠে আসতে পারত। অপারেশন বর্গা নামে পরিচিত যে সরকারী আইন কৈলাশের উদ্দেশ্যে মাটির সাথে সবচেয়ে নিবিড়ভাবে জড়িত মানুষটির সাথে মাটির অধিকার তুলে দেওয়া। এ অধিকার সম্পূর্ণ না হলেও এটা অধিকারভোগী জোতদারের ভেতর ভাগচাষীর অধিকার তুলে দেওয়া। কিন্তু ভাগচাষীর ন্যায্য পাওনা যখন সরকারী আইন হয়ে আসে তখন প্রয়োগ স্তরে তার অভ্যন্তরীণ লক্ষ্যটাই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। মাটির সাথে, উৎপাদিত ফসলের সঙ্গে, উৎপাদনের সাহসের সাথে, বীজ থেকে ফসল হয়ে ওঠার ইতিহাসের সাথে জমিদারের সম্পর্ক কখনই ঘনিষ্ঠ নয় অথচ ফসলের ভোগের অধিকার তাদেরই। পদ্মনাথ-আসিন্দির-কৈলাশের জীবনগুলো মূল্যবোধের মূল বৃত্তে বসবাস করেও খুঁজে পায় না জীবনের প্রকৃত অর্থ। জীবন ধারণের জন্য যে অন্ন দরকার তার জন্য উৎপাদন, জীবিকার পাশে জীবনের গতিপথ তারা খুঁজে পায় নি। বিশেষ করে কৈলাশের দৈহিক মানসিক ভাষ্যে মানবিক অধঃপতনের দিকটি যেন 'জোত জমি'তে বেশি করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। যুগ যুগ ধরে ভাগচাষী ও জোতদারদের দ্বন্দ্বে জোতদারদের নৈতিক চেতনার স্বাভাবিক মানবিকতার দিকটি ম্লান হয়ে উঠেছে। আর ভাগচাষীরা মূল্যবোধ দারুণভাবে বুঝেও প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে হারিয়ে ফেলে জীবনে চলার জন্য প্রকৃত মূল্যবোধ। 'জোত জমি' একটি ভয়ঙ্কর দলিলের সামিল হয়ে সমাজের বুকে বাস বস করা একটি নির্মম সমাজের পরিচয় তুলে ধরে। হতাশায় ভোগা কিছু মানুষের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরে। মানুষ যে আদিম কাল ধরে নানাভাবে নানা রূপে অধঃপতনের শিকার এবং একদল মানুষ সেই দিকে ঠেলে দেয় তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই আলোচ্য গল্প।

দেবেশ রায় আলোচ্য গল্পে গল্পের আবেদন অনুযায়ী আমাদের সেই পথেই নিয়ে গেছেন। যেখানে মানুষ তার ন্যায় নীতির আদর্শ দিক ভ্রষ্ট হয়ে চলেছে, সেখানে তাকে থামানোর কেউ নেই। আছে শুধু নৈতিক চেতনার অবক্ষয়, মূল্যবোধহীনতার কঠিন প্রতিচ্ছবি, হতাশার গাঢ় অন্ধকার। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এগিয়ে আসছে এমনই বিপদ সঙ্কেত। গভীর গভীরতার অসুখে পৃথিবীর মানুষ যেদিকে দিন দিন এগিয়ে চলেছে ' জোত জমি' গল্প তার প্রখর দৃষ্টান্ত।

'নিরস্ত্রীকরণ' গল্পটি ট্রেন যাত্রার পটভূমিকায় ট্রেনের কামরার বহু চরিত্রের সংলাপে বিধৃত। ভারতীয় রেলের সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় নিত্য নৈমিতিযক ঘটনা সহযাত্রীর সাথে গোপন বা প্রকাশ্য রেষারেষি, স্থান সঙ্কুলান সমস্ত চিত্রটি খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। রেলের যাত্রীদের নির্দিষ্ট কামরার দুই মহিলার কথোপকথনে একদিকে যেমন বাঙালি নিম্ন মধ্যবিত্তের নারী মানসিকতার অন্দরমহল উদঘাটিত হয়েছে তেমনি মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বভাব সুলভ আচার সংস্কারের মানদণ্ডটিকেও সংক্ষেপে মেপে দিয়েছেন লেখক। অনেক চরিত্রের ভিরে রেলযাত্রার সাথে সাথে পারস্পরিক কৌতুহল যখন বাংলার রেলযাত্রার আদল গড়ছিল, ঠিক তখনই এক মধ্যবয়স্ক চরিত্রের জরানীশ্রুত ভয় সমগ্র কামরাটাকে একটা আতঙ্কে গ্রাস করে ফেলে। রাতের সেই ট্রেনে নির্দিষ্ট কোন এক স্টেশনে চুরি অনিবার্য— এই ভীতি সবার মাঝে ঢুকে যায়। অতি সাবধানি দু'একজন যাত্রীর উদ্যোগে ট্রেনের কামরার দরজার ছিটকিনি বন্ধ হয়ে যায়। চুরির খ্যাতি পাওয়া নির্দিষ্ট স্টেশন পার না হওয়া পর্যন্ত। ঐ কামরায় চার-পাঁচজন ছিল বেকার যুবক। যারা বেকার, কর্মহীন। কোলকাতায় যাচ্ছে চাকরীর পরীক্ষা দিতে। তাদের জবানীতে ঝরে পড়ে ৬২'এর চীন-ভারত যুদ্ধের ভয়ঙ্কর আবহের কথা। যেখানে জীবন যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বিদেশের ছোড়া মারণাস্ত্রের আঘাতে। রাতের সেই চুরি ডাকাতির আবহ ঐ যুবকদের মধ্যে একজন কস্টকম্পিত গল্প ফেদে আরও বাড়িয়ে তোলে। অতঃপর আসে সেই নির্দিষ্ট স্টেশনটি যাকে নিয়ে ট্রেনের এই কামরাটি ভীত-সন্ত্রস্ত। সত্যিই এক মানুষের জোড় ধাক্কার শব্দ পড়ে ট্রেনের ছিটকিনি দেওয়া সেই দরজায়। প্রথমে ধাক্কা দেওয়া মানুষটির স্বর আদেশের মত শোনাচ্ছিল যা কামরায় ভেতরে থাকা চোর-ডাকাত ভীত মানুষগুলিকে আতঙ্কের চরম অবস্থায় নিয়ে যায়,

ট্রেন চলা শুরু করলে আবার উপর্যুপরি দরজায় আঘাত জীবন ভীত বা বলা ভালো সাক্ষাৎ মরণের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টাকারী দরজার বাইরে ঝোলা সেই মানুষটির। কামরায় ভেতরে তখন ভীত দু'একজন মানুষের দরজায় আটকে দারানো, বেকার যুবকদের মধ্যে থাকা দু-একজন যুবকের দরজার খুলতে চাওয়া ইত্যাদি ঘটনায় মুখরিত। শেষ পর্যন্ত বহু চেষ্টার ফলেও বন্ধ দরজার ছিটকিনি খোলা গেল না ভীতু মানুষগুলির পূর্বশ্রুত আতঙ্কে। ধীরে ধীরে দরজার আঘাতের সাথে কাতর প্রাণ ভিক্ষার মতো আবেদনও কামরার ভেতরে থাকা মানুষগুলির মন গলাতে পারল না। শেষ পর্যন্ত দরজার আঘাত একসময় বন্ধ হল। নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে গেল ট্রেন, বাইরে ঝুলে থাকা সেই মানুষটি আর নেই। এক পূর্বশ্রুত ভীতি, এক আশঙ্কা একটা মানুষের জীবন এভাবেই কেড়ে নিল। কামরার সমস্ত যাত্রীদের একদিকে যেমন আসন্ন বিপদের আশঙ্কার লেশ না রেখে তা থেকে মুক্তি দিয়েছে তেমনি একটা মানুষকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়ার অন্ধকার তাদের গ্রাস করতে ছাড়েনি।

এভাবেই লেখক মানুষের চেতনা বিবেকের একটা অবনতির ছবি এঁকেছেন। বিচার নয় বিবেচনা নয়, অলক্ষ্য আশঙ্কা একটা মানুষের জীবন ছিনিয়ে নিলেও তাতে কারো তেমন কিছু এসে যায় না।

দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডের একটি অন্যতম গল্প 'সতীমিলিদের নিয়ে'। ১৯৬৫ তে লেখা এই গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'এক্ষণ' পত্রিকায়। গল্পের শুরুটি এই রকম—

> ''চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে প্রধানত দুটি বিষয়ে আলোচনা চলছিল—এক. ভারতবর্ষের পক্ষে আদৌ কোন পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে কিনা ও মিছামিছি এত টাকা পয়সা খরচ করে পরিকল্পনা করার দরকারটা কি? বরং তার চাইতে যার যা খুশি করুক। দুই. যদি শেষ পর্যন্ত চতুর্থ পরিকল্পনার ভূত খাড় থেকে নামানো না-ই যায় তবে প্রয়োজনীয় অর্থে সংস্থান হবে কীরূপে?''[৩২]

মূলত এই দুটি প্রশ্ন সামনে রেখে গল্পের শুরুটা হলেও গল্পের আখ্যানে উঠে এসেছে 'নারী'কে

পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে অর্থনীতি চাঙ্গা করার তত্ত্ব। এই বিষয়টিকে সামনে রেখে কমিশনের দুই সদস্যের অভিজ্ঞতার গল্প বর্ণনায় ফুটে উঠে সমাজের অবক্ষয়িত মূল্যবোধের চিত্রটি। প্রথম সদস্য সতী নামক একজন কুলবধূর ছবি দেখিয়ে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে কমিশনের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করছেন যে এই কুলবধূদের যদি পারিবারিক গণ্ডি থেকে বের করে নিয়ে এসে সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যায় তাহলে দুটি বিষয় ঘটতে পারে।

প্রথমতঃ এরা একটি খুব ভাল কেন্দ্রাভগি শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ যদি এদের কোন সামাজিক আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রে স্থাপন করা যয় তবে প্রচুর অর্থাগমও হবে।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় নারীদের 'সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ' অর্থাৎ নারীকে পণ্যে পরিণত করার প্রচেষ্টা। যা বর্তমানে স্বাভাবিক ঘটনার ন্যায় অনায়াসেই আমাদের চোখে পড়ে, এবং আমরা তা অধিকাংশ সময়ই মেনে নিয়েছি। পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীর পণ্য হয়ে ওঠা এমন হয়তো সামাজিক মূল্যবোধকে তেমন হয়তো পড়িত করে না। যে নারীদের কথা বলে সামাজিক ক্ষেত্রে নারীকে সমানাধিকার দেওয়ার প্রতিজ্ঞায় স্বরে স্বর মিলিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। পরোক্ষণেই বাস্তব চিত্র দেখে কখনও কখনও আঁতকে উঠি। যাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজের অগ্রগতির ধ্বজা ওড়ানোর কথা তারা তো এখনও পুরুষের কাছে কামনার বস্তুমাত্র। অর্থাৎ এক শ্রেণির পুরুষের কাছে তাদের কামনা-ভোগ-লালসার জোগান দিতে সতীদের অসতী হয়ে ওঠা। কমিশনের দ্বিতীয় সদস্যের কথাতেও উঠে এসেছে কলকাতা শহরের মিলি নামে একটি মেয়ের কথা। যে কিনা জীবন জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছে গণিকাবৃত্তি। কিন্তু মিলির মত পারদর্শী গণিকা আজ বেশ্যাবৃত্তি নিরোধের আইনের ফলে মদের দোকানে মক্কেল খুঁজে বেড়ায়। গণিকাবৃত্তি নিরোধ আইন সত্ত্বেও যারা গণিকাসঙ্গ করতে চায় তাদের মধ্যে সুশীল সমাজের নাগরিকের সংখ্যাও নেহাত কম নেই। লেখক গল্পে জানিয়েছে তারা হল—বুদ্ধিজীবী ছাত্র, হঠাৎ-পাওয়া টাকায় নবাব, বহু সন্তানরে জনক পৌঢ়, নতুন স্বাধীন হওয়া কোন ব্যবসায়ী নন্দন। গল্পে কমিশনের রিপোর্টে মেয়ে ঘটিত যে সব মন্তব্য রয়েছে তার মধ্যে একটি অন্যতম মন্তব্য—

''ব্যাপক হারে দেশে গণিকা ব্যবসার পত্তন করলে প্রতিটি শ্রেণির জন্য

আলাদা-আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে। যেমন অনেক অভিজাত মহিলাও উত্তেজনা খুঁজে বেড়ান, তাঁদের জন্য অভিজাত পল্লীতে নানা ব্যবস্থা রাখতে হবে, আবার অনেক অভিজাত পুরুষ মাঝে মধ্যে আদিবাসী আস্বাদন করতে চায়, তাদের জন্য অভিজাত আদিবাসী পল্লীর ব্যবস্থা করতে হবে।''[৩৩]

অবক্ষয়িত মূল্যবোধের একটি অসাধারণ চিত্র, এই গল্পে তিনি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

'বৃষ্টিবদল' গল্পটিতে তিনি সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র নির্মল ঘোষ। সে পেশায় ছবি সংগ্রাহক। ভালো ছবি ক্যামেরা বন্দি করা তার পেশা ও নেশা দুটোই। কিন্তু সাদা-কালো ছবি বাতিল হওয়ার পর নির্মল ক্যামেরার জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে টিভি সিরিয়ালের প্রোডাকসন ম্যানেজারির কাজ নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অতীতের স্মৃতি তাকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে। ক্যামেরার লেন্সে চোখ দিয়ে দেখা ও খোলা চোখে দেখার মধ্যে বাস্তবতার দুই ভিন্নতর রূপ তার কাছে ধরা পড়ে। একটি শিশুর বিকাশে মাতৃদুগ্ধর গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞাপনের বিষয় নিয়ে বন্ধু প্রসাদের সঙ্গে তার আলোচনায় মায়ের বুকের দুধের প্রসঙ্গ ধীরে ধীরে বদলে যায় কোন যুবতী নারীর বুকের স্তনের কথায় উঠে আসে ব্লু ফ্লিমের বাণিজ্যিক রেটের প্রসঙ্গ। মাতৃদুগ্ধের বিকল্পহীনতার ভেতর ধরা পড়ে সমাজ বাস্তবতার অবক্ষয়ের ছবি। ক্যামেরার সাদা-কালো ছবি বদলে যায় বাণিজ্যিক চলচিত্রের রঙিন জগতে। এই ঘটনা নির্মলের ব্যক্তি ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবন-জীবিকার এই নতুন পেশা তার মানবিক সত্তাকে কোথাও যেন পীড়িত করে বুকের ভিতরের অদম্য গোপন জ্বালায় নির্মল ঘোষ তার ক্যামেরার লেন্সে চোখ রাখার শিল্পী সত্তা হারিয়ে ফেলেন। তিনি বুঝতে পারেন না সাদা-কালো ছবি থেকে রঙিন বাণিজ্যিক চলচিত্রে যাত্রার কারণ কি? কেননা যেখানে 'মাতৃস্তন' বদলে যায় যৌন ভাবনায় কোন নারীর স্তনে। পরিবার কল্যাণের বিষয় বদলে যায় ব্লু ফ্লিমে। গল্পে নির্মল ঘোষের চিন্তা-ভাবনা-চেতনায় সামাজিক অবক্ষয়তার এই চিত্র বর্তমান সময়ে আমাদের আরও বেশি করে গ্রাস করেছে। সামান্য পণ্য দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের নারী শরীরকে এমনভাবে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় তা নিত্য- নৈমিত্তিক

ঘটনার মতোই স্বাভাবিক ঘটনার মতোই মনে হয়। দেবেশ রায় সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র এই গল্পে নিপুণভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন।

কালের অগ্রগতিতে এগিয়ে চলে আমাদের সমাজ। এই অগ্রগতির প্রতিটি বাঁকে বাঁকে বিবর্তীত হয় সামাজিক চাহিদার নানা রূপ। পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নিত্য ভাঙা গড়ার খেলায় কালে-কালান্তরে এগিয়ে যায় সমাজ ব্যবস্থা। বর্তমান সামাজিক কাঠামোর নবতর সংস্করণের রূপক সম্পর্কে ভাবিত হয়ে অবশেষে যেমন ধরেই নিই তা আসলে আধুনিকতার ফসল মাত্র। পাশাপাশি সামাজিক সচেতন সহৃদয় নাগরিকের মানসপটে ভেসে ওঠে সমাজের বিকৃত চেহারার চিত্রটি। যা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা ও সহৃদয় সামাজিক বিকৃত আধুনিকতার কড়াল গ্রাসে কলুষিত হয়ে চলছে সুস্থ সামাজিক কাঠামো। এবং তার থেকে ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছে নৈতিক চেতনার অপমৃত্যু, মূল্যবোধহীনতা ও হতাশা নামক সামাজিক মারণ ব্যাধি। সমাজ বাস্তবতার এই ছবি প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রতিফলিত হয়েছে দেবেশ রায়র আলোচ্য ছোটগল্পগুলিতে।

দিন যত গড়িয়ে গেছে দেবেশ রায়ের গল্পের বুনট ততই পরিবর্তীত চলেছে। স্থূল, দৃশ্য থেকে তিনি প্রবেশ করেছেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে। ব্যক্তি জীবনের অন্তর এবং অন্তর্ঘাতের সূক্ষ্মতর আবেগ, অনুভূতি এবং চেতনার অতল তলে নিমজ্জিত স্বল্প শিহরণকেও তুলে এনেছেন তার গল্পে। এমনই এক কাহিনি অবলম্বন করে 'শারদীয় যুগান্তর' পত্রিকায় (১৪১৩/সেপ্টেম্বর ২০০৬) লিখলেন 'পাখোয়াল'।

'পাখোয়াল' গল্পে মূল চরিত্র জুনিয়ার। আরও দুই একটি চরিত্র মূল চরিত্রের কাহিনিকে বিকশিত করার জন্য তুলে আনা হয়েছে। জুনিয়ার একজন হরবোলা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। মূল দলের থেকে তাকে আলাদা করে দেওয়া হয়নি। হয়তো তার প্রতিভা দিয়ে অনুষ্ঠানের চরিত্রকে বৈচিত্র এনে দেওয়ার তাগিদে বা তার বিভিন্ন আওয়াজ সৃষ্টি করার প্রতিভাকে কাজে লাগানোর জন্য। অন্যান্য আর্টিস্টরা যেখানে দশ পনের হাজার টাকা করে পায়, সেখানে তাকে দেওয়া হয় পঁচিশ টাকা। এর আগে তার পারিশ্রমিক তাও ছিল না। নেহাত ভদ্রলোকের ছেলে, তাই মুখ লজ্জায় পঁচিশ টাকায় এনে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

জুনিয়ার বি.এ. পাশ করেছে। উল্লেখ্য দেবেশ যে সময়ে বসে এই গল্প লিখছেন তখন ধীরে ধীরে শিক্ষার ক্ষেত্র বাড়তে শুরু করেছে দ্রুত হারে। তেমনি অবশ্যম্ভাবী রূপে বেকারত্ব সমাজকে ধীরে ধীরে রেখাপাত করছে। তাই হয়তো বি.এ. পাশ করার পরেও জুনিয়ারের কোন কর্মস্থানের ব্যবস্থা হয়নি। তাছাড়া জুনিয়ার নিজেও সে চেষ্টা করেনি কোনদিন। তায় প্রকৃতি প্রদত্ত প্রতিভাকে নিয়েই জীবন সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিল। জুনিয়ারো পারিশ্রম বাড়িয়ে দিয়েছিল অফিস ক্লাব আর বংলাল। মলিদিও তার রেট বাড়িয়ে দিতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। অনুষ্ঠানকারীদের বুঝিয়েছিল এই চড়া বাজারের উষ্ণতায় যেখানে সব কিছুর মূল্য ঊর্ধ্বমুখী সেখানে জুনিয়ারের পারিশ্রমিক এতটা কম হলে চলে না। কিন্তু মানুষকে চিনে নেওয়া মানুষের পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন। যে বাংলাল ভাই তার অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন, যে মানুষটা তার পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দেবার জন্য যুদ্ধ কনের তারই কোন এক গভীর জাতাকলে খুনের মত মারাত্মক অভিযোগ লেগে যায় জুনিয়ারের জীবনে। মুহূর্তে জুনিয়ারের জীবন থেকে সহজ স্বপ্নগুলো দৃশ্য পাল্টে ফেলে। নেমে আসে আতঙ্ক, ভয় এবং মৃত্যুর হাতছানি।

জুনিয়র বুঝতে পারে না যে বাংলা ভাই তার ফাংসন দেখতে গিয়ে—এমন মুখ খুলে হাসত যে দেখলে টি.ভি। বিজ্ঞাপনের ট্রাঙ্ক ড্রাইভারের মত পরিশ্রমী, শাদাসিধে আর ভালো মনে হত। তেমন একটা মানুষ কি তাকে, জুনিয়ারকে, একটা খুনের কাজে লাগাতে পারে? বা সে নিজেই কি পারে একটা খুন করতে? বা খুনের ব্যবস্থা করতে? জুনিয়ার ভেবে পায় না রংলাল তাকে কি ফাসিয়েছে অন্যে রংলালকে ফাসিয়ে দিয়েছে বলে! তাই জুনিয়ার আজ আদালতের সিড়িতে জীবনের সব স্বপ্ন, সব কল্পনাকে উপড়ে ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নিরালম্ব অসীম দরিয়ায়। ভেতরে ভেতরে রয়েছে খুনের ছায়া আতঙ্ক। রুম্পা তাকে যেখানে দাঁড় করিয়ে আদালতে ঢুকলো যেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে। কারর অনাহুত বা বলা ভালো অনিবার্য মৃত্যু কড়ায়াত তার শিড়ে আসার অপার সম্ভাব না।

সহজ জীবন থেকে বিচ্যুত জুনিয়ার দিশাহীন। সরল জীবনের চোখে দেখা কানে শোনা প্রকৃতিতে সেই সরলতাকেই জীবনের অবলম্বন করেছে সেখানে সমাজের গভীর ষড়যন্ত্র তাকে জটিল আবর্তনে টেনে এনেছে। জুনিয়ারকে যেখানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া

হয়েছে সেখানকার সিকিউরিটির কথা বারবার ঘুরে ফিরে বলা হয়েছে। পাশাপাশি লেখক জানাচ্ছেন সে জায়গাটাতে 'দুই কম আড়াই কুড়ি মন্ত্রী এখন এখানে।' তাই জুনিয়ার এখানে সবচেয়ে নিরাপদ। লেখক কী এখানে মন্ত্রী আর বড় বড় প্রতিষ্ঠানের কথা বলে কী রাষ্ট্র শক্তির বহু খুনী হওয়ার সম্ভাবনাকে উস্কে দিতে চেয়েছিলেন যেখানে শত হত রক্তের উপর শাসকের আরসপাতা থাকে। সেই কারণেই কী তাদের এত নিরাপত্তার দরকার যেখানে একটিমাত্র খুনের অভিযোগে আদালতের সিড়ির কাছে সজোরে স্বাচ্ছন্দবোধ করতে পারে? যাহোক নিজের স্বাভাবিক জীবন থেকে উৎখাত হয়ে জুনিয়ার নিজের কাছ থেকেই পালানোর জন্য হাতরে মরতে থাকে। আদালতের সিড়ি থেকে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে জাগতিক সমস্ত কিছু তার গোলমেলে ঠেকে। বুঝে উঠতে পারে না কালের সাধারণ জ্ঞানকে। পুলিশ তার নামে ছবি ছেপে সন্ধান পাওয়ার জন্য। আত্ম দ্বন্দ্বে, আতঙ্ক এবং আতঙ্কহীন হওয়ার সন্ধিক্ষণে নিজেকে ছুপিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনাও সে করে। ঢুকে যায় পার্লারে। নিজেকে কিছুটা পরিবর্তনও করে। খবরের কাগজে তার ছবি বা কোন খোঁজ নেওয়ার সংবাদ না দেকে মুহূর্তখানিক নিজেকে এই গভীর সংকট থেকে মুক্ত ভেবেও শেষ পর্যন্ত পূর্বের পুলিশের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সমর্পণ করা স্থির করে। ডি.আই.জি. অফিসের সরকারী আধিকারীকদের যান্ত্রিক আচরণ তার জীবনকে যেমন সংকটের কাছে আত্মসমর্পণের পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে তেমনি লেখক এই চিত্রের মধ্য দিয়ে শাসনতান্ত্রিক অসাড়তা এবং শাসন যন্ত্রের হাস্যকর দিকটি তুলে ধরেছেন।

শেষ পর্যন্ত জুনিয়ার নিজের পরিচয়, নিজের ছবি সমেত নিজেকে মেলে ধরার পরেও শাসনযন্ত্র অলীক নিয়মে অনিয়মের পরকাষ্টা দেখিয়ে এক হাস্যকর বাতাবরণ তৈরি করেছে। জীবনের সহজ সলরতা। মানুষের বিশ্বাসহন্তা একটি মানুষের জীবন যেমন জীবনের বৃক্ষ থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে জীবন সংকটের ভাগাড়ে, তেমনি শাসনযন্ত্রের কঙ্কালপর রূপটিও ইঙ্গিত লেখক তুলে দিয়েছেন সূক্ষ্মভাবে।

ছ. বিবিধ :

স্মৃতি নিয়ে বাঁচার অনেক সুবিধে, আবার স্মৃতি নিয়ে বাঁচার রয়েছে অনেক অসুবিধেও।

কারণ স্মৃতি সততই সুখের হতে পারে, কোনো এক বিমর্ষ দিন যাপনের অতীতকে ওঠা দুঃসময় থেকেও আসতে পারে মানসিক অবসাদের বিপর্যয়। অন্তর্মুখী মনের দর্শন দিয়ে অনেকেই তার নিজের বাঁচার পথ খুঁজে নেন। আর সেখানে একাকীত্বের আবরণ মনের অজান্তে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। বেঁচে থাকার বিচিত্র দিক সহ্য করতে করতে কোথাও একজন মানুষকে একাকীত্বের মাঝেও সবাইকে নিয়ে চলতে হয়, সবার মাঝে একাকীত্বের ব্যক্তি আমি বেছে নেয় নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতা। ফলে এই যে বেঁচে থাকা নিজেকে নিয়ে, তার মধ্যে দিবা নিশি চলতে থাকে মনের প্রক্রিয়া। তার রঙ তার রূপ বহু বিচিত্র। গল্পকার দেবেশ রায় গল্প প্রেজেন্ট করানোর তারতম্যে চেতনাপ্রবাহ রীতির এক অদ্ভুদ স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গল্পে। যেখানে আলাদা ভাবে এই গল্পগুলিকে নির্বাচন করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক পর্বের অধ্যায়ে কোনোও ভাবে ঠেলে দেওয়া যাবে না। শুধু যে একাকীত্ব নিঃসঙ্গতার বিষয়ই এই অণু অধ্যায়ে আলোচিত হবে তাই নয়, রয়েছে ইচ্ছামৃত্যুর গভীরে ইচ্ছা-অনিচ্ছার সাঙঘাতিক টানাপোড়েন, প্রতিবন্ধী মানুষের কত বিচিত্র, উদ্ভুদ রকমের বেঁচে থাকার লড়াই, জন্মভূমি ছেড়ে চিরকালের মতো আপন দেশ ছেড়ে চলে যাবার মত অশেষ বেদনা, বেদনার বৃত্তান্ত। জীবিকা কেনা কোন সময় লড়াইয়ে কীভাবে হিংস্র হয়ে পড়ে, তার স্বাভাবিকতা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হয়ে পড়ে অধপতনের নির্দিষ্ট ঠিকানা। এই বিবিধে রয়েছে তার আলোচনা।

দেবেশ রায়ের গল্পের প্রথম দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, দেখব মনস্তত্ত্বমূলক পরিস্থিতির একটা বড় আয়োজন তাঁর গল্পে কারণে অকারণে নানাভাবে ফিরে এসেছে। এবং গল্পগুলিও হয়েছে শিল্প সম্বন্ধে। যাইহোক, শুরুতেই বলেছি স্মৃতির প্রসঙ্গ এবার এই বিষয়েই প্রথমেই প্রবেশ করা যাক। গল্প জীবনের আরম্ভে তাঁর 'কাল রাতের বেলায়' গল্প আমাদের এক অদ্ভুদ মুগ্ধতা দেয়। এই গল্পে লক্ষণীয়, অনু নামের চরিত্রটি সর্বদা বারবার উচ্চারিত হয়েছে, তাঁকে উপলব্ধি করতে গিয়ে তার মনের ভেতর আবস্কিত হয়েছে স্মৃতি, একাকীত্ব এবং একা একা কথা বলা মানসিক অবসাদের বিস্তৃত পরিসর। স্মৃতি বিজড়িত কিছু অমলিন সম্পর্ক মনে দাগ কেটে গেলে তার ফল অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়ে যায়। সেই সম্পর্কের দাগ থেকেই ঘটে যত বিপত্তি। আসলে শূন্যতা মানুষকে কুড়ে কুড়ে

খেতে জালে তার সুস্পষ্ট দর্শন 'কাল রাতের বেলায়' গল্প।

গল্প আরম্ভ হওয়ার পরই গতানুগতিক জীবন কাহিনির রেশ থাকা সত্ত্বেও কোথাও যেন একটা অদৃশ্য অভাব ভেসে আসে। সেখানে অণুর উপস্থিতি সেই অদৃশ্য অভাবকে যেন ভাষা প্রদান করে। গল্পের প্রথমেই দেখি এই চিত্র—

> ''মাঝরাত। অনু ঘুমুতে চাইছিল। অনু আজ কদিন হল একা-একা এই শুচ্ছে। বাড়িটা বিশেষ বড় নয়। তিন-কোঠাওয়ালা এই বাড়িটাতে একটা ঘর বৈঠকখানা, একটা ঘর বাবা-মা অনু-রুন্‌কুর শোবার আর একটা এমনি খালি পড়ে থাকত, দিদি যখন শ্বশুর বাড়িতে, অথচ এ-ঘরটা ভরা এবং অনুই ভরিয়ে রেখেছে এ-কথাটা অনু প্রতিদিন সকালবেলায় বিছানায় আড়মুড়ি ভাঙতে ভাঙতে টের পেয়েছে।''[৩৪]

দেড় মাস আগে অনুদের বাড়িতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকা মুকুলদিরা চলে গেছে। এই দেড় মাসের শূন্যতা থেকে অনুর মনে-মননে তাদের স্মৃতি নানাভাবে ভেসে আসে। সেই ঘর কিছুদিন পর ভরাট হয়ে যায়।

অনুকে নিয়ে গল্প লেখকের বারবার উল্লেখ দেখা যায়। বিশেষত মুকুলদিদের চলাফেরার অনুরণন অবধি অনুর কাছে স্পষ্ট ইজিতের মতো। আর এখানেই অনুর মায়ের সাথে অনুর একটা মানসিক পার্থক্য গল্পকার সচেতনভাবে আমাদের মনের উপর আলোকপাত ঘটাতে চান। গভীর মনোযোগ এবং গভীর সম্পর্ক দিয়ে কাউকে দিনের পর দিন অন্তরে ধরে রাখলে তার পরিণাম অনুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। অনুর মা এবং অনুর মধ্যে পার্থক্যর একটি সুস্পষ্ট রেখা তৈরি হয়। সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম সম্পর্কের বননগুলোও অনু মনে রেখে দিয়েছে। মুকুলদিদের প্রত্যেকটা আকার ইজিতের জীবিত স্বর হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু তার মায়ের মধ্যে মুকুলদিদের প্রস্থান প্রসঙ্গ কোনোভাবে মনে দাগ কাটতে দেখা যায় না। তাদের প্রতি অনুর টান দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে আছে। এই একঘেয়ে মানসিকতার খপ্পড়ে পড়ে গল্পে তাকে আমরা একাকীত্বের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে দেখি।

গল্পের সর্বত্র অনুর উপস্থিতি ক্রমশ তার মন মানসিকতার শিরা-উপশিরাগুলোকে বুঝি দিচ্ছিল সুস্থ জীবনযাপনের স্বাভাবিক মাত্রা তার জীবনে দিন দিন ঘনিয়ে আসছে।

আসলে প্রিয় আপন জনের বন্ধন ছিন্ন হলে তার পরিণতি তো পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকেই পোহাতে হয়। চিরাচরিত নারীর মধ্যে যে দুঃখ বেদনা প্রকাশ পায় তা, বেশিরভাগ সময়ই চোখের জলে। তাদের সেই বৃত্তের মধ্যে মরতে হয় তিলে তিলে। কিন্তু এখানে গল্পকার দেবেশ সেই চেনা পথে না হেঁটে তাঁর নিজস্ব মুন্সিয়ানায় দৃষ্টিপাত করেছেন। অনুকে সম্পূর্ণভাবে নিকড়ে তার নারী সত্তার অবয়বটিকে তিনি যেন গভীরভাবে তুলে এনে তার চেতনা প্রবাহ রীতির অন্তর্দ্বন্দ্বকে উপস্থিত করিয়েছেন অতিকথন বা বাড়তি প্রসঙ্গের সহায়তা ছাড়াই। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুর ওঠা-পড়ার দিকগুলি আমাদের গভীর পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায়। একাকীত্ব এক সময় তাকে আক্রমণ করতে করতে পেয়ে বসে। এবং সেখান থেকে তার বেরোনোর উপায় নেই, এ আবহ গল্পে সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। অনুকে যা দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে সব তার মনগড়া আপাত অর্থে মনে হয়। গল্পের আবেদন বলে যায় অন্য কথা। পরিবারের লোকেরা গল্পে প্রাধানয পেয়েছে অনুর তুলনায় যথেষ্ট কম। কেননা অনুর মত করে কাউকে এই অবসাদে ভুগতে হয়নি। যদি গল্পের গতিকে সাক্ষী রেখে কিছু কিছু পরিস্থিতি তুলে ধরি তাহলে বুঝব তার মনের ভেতর দিয়ে কখন, কোথায়, কীভাবে ঝড় বয়ে গেছে। আর সেই ঝড়ে সে শুধু ক্রমশ হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। যেমন—

১. 'অথচ মুকুলদিরা চলে যাবার পর এই দেড় মাস ধরে ঐ বাড়িটা খালি পড়ে আছে ...। আর এই ফাঁকা বাড়িটির নানারকম শব্দ আর নৈঃশব্দ্য সেই প্রথম একা শোয়ার রাতে অনুকে ভীত করে তুলেছিল সবচেয়ে বেশি করে। কিন্তু তারপর অনু একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে—সকাল হলে জেগেছে।'[৩৫]

২. 'যেন অনু জানে মাঝরাতে, কোন্ একটা অদ্ভুদ জায়গা থেকে এখানে, এই পাশের বাড়িতে যাদের আসবার কথা—তারা এলে কী কী রকম শব্দ হবে, শব্দগুলোকে সে দেখে নিচ্ছে যে, এ শব্দ ঠিক সে শব্দ কিনা।'[৩৬]

৩. 'আবার পাশের বাড়িতে শব্দ জেগে উঠল, যেন অনেকে কথা বলছে। মোটা সরু নানা গলার কোনো কথা অনু শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু সেই ঘরে—মুকুলদিরা যে-ঘরে ছিল, ছোটবেলা থেকে যে ঘরে অনু খেলেছে বেড়েছে, আর এই অন্ধকারে যখন বস্তু সম্প্রসারিত হয়। যে ঘরটাকে তার ঘরেরই অংশ বলে মনে হচ্ছে, যে ঘরের কথাগুলোর শব্দকে মনে

হচ্ছে এই ঘরেরই সব শব্দ অনুর রক্তকল্লোলের মত শোনাল।'[৩৭]

৪. 'অনেকক্ষণ পর অনুই দৃষ্টি হয়ে গেল। অনু যেন তার কপালের দুটো চোখ দিয়ে কিছু দেখছে না, অনু যেন তার সর্বাচ্য দিয়ে দর্শন করছে, মধ্যরাতের বাতায়নে একটা অন্দ্রি দেহ নয়, দুটো উন্নিদ্র চোখ।'[৩৮]

সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জীবনের খোঁজে দেবেশ রায়কে এভাবেই নিরন্তর ছুটতে দেখা যাচ্ছে। অনুদের মতো মেয়েদের গোপন জীবনযাপনে প্রতি মুহূর্তের জীবনীকার রূপে তাঁকে পাওয়া গেছে। মূল স্রোতের গল্প থেকে খুব সম্ভবত তাঁকে ভিন্ন ভাবে পা ফেলাও হয়নি তাঁর গল্পের কনটেন্টই কোথাও আলাদা করে দিয়েছে। নিঃসঙ্গ মানুষদের নিঃসঙ্গতার এক পৃথিবী অঙ্কণে দেবেশ রায় যেন গভীর এক সুড়ঙ্গে ঢুকে পাঁক থেকে তুলে আনেন এমন কিছু অকথিত কথাই। তাদের মুখে নীরব ভাষা অঙ্কণ থেকে শরীরী ভাষার জীবন্ত অনুবাদ হয়ে থাকে তাঁর 'কাল রাতের বেলায়।'

কবিতার মতো বারবার প্রতিধ্বনি তোলে তাঁর গল্পের বিশেষ কিছু মুহূর্ত। একই কথা বাক্যের চলমান গতিতে নানাভাবে ফিরে আসে ক্ষত ঝরে পড়া জন্মদাগ প্রকাশ করতে। 'পশ্চাৎভূমি' গল্প এমনই এক আবহে দীর্ঘ সময় বন্দী করে রাখতে চায়। বাতাস এলোমেলো হয়ে প্রবেশ করলে গল্পের বীজে অসুখের একটা দিনলিপির চিত্র আসে আগমনী হয়ে। আরম্ভটা হল এরকম 'বাতাস ছিল এলোমেলো সারাটা দিন। সারাটা দিন চৈত্র মাসের মত বাতাস ছিল এলোমেলো—সারাটা দিন।' ' পশ্চাৎভূমি'র মূল আবেদনে আত্মভাবনার হিকার হয়ে পড়া আত্মক্ষয়ের নিবিড় পাঠ রয়েছে। সুধীরবাবুর অন্য প্রেক্ষাপটে গল্পে উপস্থিতি ও তার স্ত্রীর সমানভাবে যোগদান, অশোকের প্রয়োজন গল্পে এনেছে সার্বলীল গতি। তবু তার মাঝে বিনয়ের আত্মভাবনা 'কাল রাতের বেলায়' গল্পের অনুর প্রতিছায়া বলে মনে হয়। কথক বা গল্পকার বিনয়ের সত্তাকে নিজের ভিতরে ধারণ করে প্রকাশ করতে চেয়েছেন স্থান-কাল-পাত্রের একটি স্থির বিষয়। সুডৌল মানসিকতার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যাঁর সূক্ষ্ম দৃশ্য বোঝা যাবে না।

অতীত-বর্তমানের নির্দিষ্ট ধ্যানে গল্পের মুখ্য চরিত্র বিনয়কে প্রত্যক্ষ করতে দেখি। 'কাল রাতের বেলায়' -এ যেমন অনু সর্বদা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভেতর জপ করত মুকুলদিদের

শূন্যতার চর্চা তেমনি এখানে চেতনাপ্রবাহ রীতি নাকি চেতনা ফেরানোর কড়া নাড়তে বোধহয় দেখা যায় বিনয়কে। 'আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি' -এ দর্শনের আবহ কখনও কখনও আবদ্ধ করে রাখে। আপন ভাবনার খেয়ালে হাঁটতে হাঁটতে অনেক সময় আত্মভাবনা প্রখর থেকে প্রখরতর রূপ ধারর করে। বিনয়ের জীবন প্রবাহের ব্যক্তি শৈলীতে তার অনুভূতিরা সময়ে-অসময়ে হাজির হয়। ঠিক যেন দর্পণের মুখোমুখি দাঁড়ানোর ন্যায় এক বিনয়ের সত্তা আর এক বিনয়ের সাথে মুখোমুখি হয়। মুখোমুখি হতে চায় অথচ পশ্চাৎভূমির গোপন আগামীতাকে মুখোমুখি হতে দেয় না। স্বভাবতই সংঘাত সেখানে বাসা বাধে। অহেতুক সন্দেহ, টানাপোড়েন, হতাশার পথে তাকে আষ্ঠে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। অথচ এ-সমস্ত জীবন যন্ত্রণার মাঝেই ফুটে ওঠে ভেবে দেখার মতো অজস্ব চিত্র।

গল্পের সর্বত্র বিনয়ের মনের গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধানই পাঠকের মুখ্য হয়ে ওঠে। তাকে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে জেগে ওঠার প্রবল তৃষ্ণাও তাড়া করে। হয়তো গল্পের মূল সুরে তারই নীরব আয়োজন রেখেছিলেন গল্পকার। সুধীরবাবু, তাঁর স্ত্রী বেলা, বাবুই, অশোকের উপস্থিতিতে ও তার প্রসঙ্গ সবসময় জীবন্ত লেগেছে গল্পে। দিশাহীন পরিস্থিতির দোলাচলতায় বিনয় তার নিজের অস্তিত্ব নিয়ে কোথাও অর্থহীন প্রতীক। ঘটে যাওয়া ঘটনা বা চলমান মোকাবিলার সম্মুখে তাকে আত্মভাবনার ফাঁকে ফাঁকে নিঃসত্য বলে আরও বেশি মনে হয়। গল্পে সেই উল্লেখ আছে চমৎকারভাবে—

> ''শব্দটা না শোনার ভাব করে বিনয় ভাবল চলছি, কিন্তু কোথায় তা তো ভাবছি না, ভেবেছি? না, বাড়ি থেকে বেরুবার সময়ও তো ভাবিনি। সকালবেলার চা-খাওয়ার মত কি সন্ধ্যাবেলাতে সুধীরদার বাড়িতে যেতেই হবে? কী হবে গিয়ে, হয়তো কাগজটা আর একবার পড়ব। কিংবা বাইরের চৌকিটায় শুয়ে থাকব, কিংবা ঐ মেয়েটার নাম যেন কী? গোপাল, ট্যার, জুই কী? মেনি বেড়াল- টেড়াল কী?''[৩৯]

সত্যিই সত্যি গল্প লেখকের স্পষ্ট ইঙ্গিতে ভেসে ওঠে, বিনয় যেন কোন এক নাবিক। যাকে কলকাতার বন্দরে জাহাজ নোকরের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এবার তার গন্তব্য শুধু পশ্চাৎভূমিতে।

বিনয় গল্পে প্রাণভূমি বলে অন্য প্রসঙ্গ ফিকে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকেও দেবেশ ঘটাতে দেননি। বাবুই চরিত্রটিও এখানে হাজির হয়েছে বিনয়ের সত্যতার গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে। মুদ্রার ওপিঠ হয়ে তাকে ছবির একটি জ্যান্ত মূর্তি রূপেই গল্পকার যেন রূপ দিতে চেয়েছেন। আলোচনার প্রথমেই বলেছিলাম কবিতায় ন্যায় একটি শব্দ বা অর্থ জলের মতো ঘুরে ঘুরে কি যেন একা একা অর্থ প্রকাশ করতে চায়। এখানে বাবুইয়ের ভিতরে ঢুকে সেই ছবি কথার চিত্র বারবার বলে তার সত্তাকে যেন উপস্থিত করানো হচ্ছে। বাবুইয়ের ভিতরে সেই গান, সেই ছবির গান বিষাদের কল্পনায় কাকে যেন আহ্বান করে। বিপন্নতার আবেশে নিঃসঙ্গতার সুর প্রকট করে। গল্প লেখকের ভাষায়—

'বাবুই জানে না, ও একটা ছবি। ছবি জানে না, সে একটা ছবি। দর্শক জানে মানুষ ছবি নয়, কবি জানে ছবি ছবি মানুষ নয়, বাবুই গান গায়, তুমি কি কেবলি ছবি?'[৪০]

আবার সুধীরবাবু ও তার স্ত্রী বেলার দাম্পত্য জীবনের রসায়নের দেবেশের বিচক্ষণ দৃষ্টিকোণ সর্বদা জাগ্রত। তাদের সাংসারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর গতানুগতিক ছবি জুড়ে চৈত্রের বাতাসের মতো একটা শিহরণ এসে উপস্থিত হয়। কুপির পরিচিত আলোর রহস্যহীন পরিবেশে তাদের তিরিশ বছরব্যাপি সম্পর্কের বন্ধন অস্পষ্ট বলে মনে হয়। বেলার মধ্যে যার রেশ আমরা দেখতে পাই। হয়তো সে বিচিত্র ভাবে পরতে ভাবতে অস্তিত্ব খননের কাজ করতো মনে মনে। তার নিজের কথাতেই রয়েছে পাপে ভরা দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের অনুতাপ বৃত্তান্ত। তাইতো বাবুইকে সে গাইতে বলেছে 'আমার আপনারে দেখতে দাও।' এ আত্মদর্শন অন্বেষণ গল্পে ডানা মেলতে চায়। বিনয় খোঁজে তার চারপাশে তার নিজেকে নিয়ে পথ হারিয়ে যাওয়া পুরনো ঠিকানা। অর্ধেক জীবন অতিক্রম করা বেলাও আপনাকে দেখার তাড়নায় মাঝে মাঝে আপন মনে জ্বলে ওঠে। আর নিঃসঙ্গতার একটি সুনির্দিষ্ট গলি অবিষ্কার করে। এখানে সবাই কোথাও নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে একই সময়ে এসে থমকে গেছে। তাদের মধ্যে প্রকাশের ভঙ্গিতেও রয়েছে এক আশ্চর্য মিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আজীবন অদৃশ্যভাবে এক নীরব বিষাদ কখনও কখনও দগ্ধ করে গেছে। তাঁর সঙ্গীতে এবিষয় আরও নানা ভাবে লক্ষণীয়। স্বয়ং নিজেকে ভাবনার আলোকে মেশাতে গিয়ে প্রকৃত সত্তার বহিঃপ্রকাশ আবিষ্কার ক্রিয়ায় কাজ করে শূন্যতা ও নিঃসঙ্গতার ভাষা। রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গল্পে প্রাণ হয়ে আছেন।

রবীন্দ্র আবহের ব্যবহার দেবেশ রায় এখানে খুব সচেতনভাবে করেছেন। তিনি জানেন রবীন্দ্রনাথ থেকে ধার নিয়ে চরিত্রগুলোর মনে মেজাজে ভালভাবে এঁকে দেওয়া যাবে সময়ের ভাষ্য। তারা কোন নির্দিষ্ট কারণের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নাম না জানা অসুখে দহন হয়ে চলেছে আমৃত্যু। নিজেকে ভাষা দিতে গিয়ে তাই ব্যক্তি স্বাধীনতার থেকেও কোথাও এখানে মুক্তির জয়-গান বড় অর্থে মূল গন্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। দুটো উদাহরণ দিলে এখানে দেখব তাদের আত্মদর্শন অনুসন্ধানে কাজ করে দিশাহীন মানসিকতা—

১. 'খুব চড়া রঙে বড় কিছু, চওড়া কিছু মস্ত কিছু। সম্মুখের সমস্ত বিষয়ের রেখা সঙ্কীর্ণ ও বর্ণ নিস্প্রাণ। সুচিত্রা মিত্রের ছবিতে বাবুই কী দেখতে চায়! আমি কী দেখাতে চাই! দেখতে দাও। আমার আপনারে।'[৪১]

২. 'বেলা এতক্ষণ কি বিচিত্রভাবে কিছু ভাবছিলেন? না। বেলা চিন্তা না, শরীর। চৈতন্য নয়, অস্তিত্ব, আমিও তাই। ব্যক্তিও ব্যক্তিত্ব থাকে। ব্যক্তি নগরে থাকে। আমার ব্যক্তিত্ব নেই। আমার ছাব্বিশ বছরের পান আছে। আমি পঞ্চদশী সরলতা চেয়েছিলাম। বাবুই, গানটা গা তো আমার আপনারে দেখতে দাও।'[৪২]

আমাদের বাধন না মানা আবদারগুলো কারোর বশ মানতে চায় না। যে হিমবাহ থেকে তার উৎপত্তি সে তাকে অতিক্রম করে পাড়ি দিতে চায় মুক্তির খোঁজে। গল্পকার নিবিড়ভাবে চির চেনা মানুষগুলোর মধ্যে এই আকুতি দেখতে পেয়েছেন। দেখতে পেয়েছেন পাহাড় থেকে নদীর চলার পথ বহুদূর হলেও সে বিশ্রাম নিতে চায় সমুদ্রের বুকে। এই পাহাড় থেকে সমুদ্রের ব্যবধানে জীবনের নিরন্তর চরাচরে মানুষের অতৃপ্ত খিদে জীবনের ন্যায় পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। ভাষা পেতে চায়। স্বরূপ হয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে চায় তার আপনাকে। 'কেটে দেওয়া কথা, ভাড়াচরণ, ইতস্তত হস্তাক্ষর' চলে চলতে থাকে। 'পশ্চাৎভূমি'র বয়ে চলা ঠিকানায়।

একটা বিষয় প্রকট হয়ে ওঠে তাঁর গল্পগুলি সম্পর্কে যে, তিনি গল্প লিখছেন না, চরিত্ররা মাটির পৃথিবীতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে লিপিবদ্ধ করতে চাইছে নিজস্ব ভাষা। কাহিনির প্রধান স্বরূপ সেদিকে ডুবে আছে স্থির সমান্তরালে। তাই তাৎক্ষণিক বর্ণনায় মনের প্রতিফলন তার বেশ কিছু গলেপ ঘুরে ফিরে এসেছে। তার সুনির্দিষ্ট আকার ইঙ্গিতে ভেসে এসেছে

সময়ের জলছবি। ফলে নিঃসঙ্গতা নিয়ে বাস করা তাঁর গল্পের জীবনেরা অসংলগ্ন মানসিক ভাবনার ভূগোলে বিচরণ করে। হয়তো সেই পরিস্থিতি নানাভাবে আমরা দেখি, নিজের মধেযও উপলব্ধি করি তবে, স্বাগত কথনে আলাদা হয়ে যায় তাদের কল্পনায় গড়া রূপগুলো। অনুচ্চারিত একক সংলাপ প্রয়োগে মানুষের বেঁচে থাকার বিচিত্র হদিশ এর আগে বাংলা ছোটগল্পে আসে নি এমন নয়, এসেছে গল্প লেখকদের জীবন অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে। দেবেশ রায়ও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন এ ধারাবাহিকের গতিকে। তাঁর একটি বিখ্যাত গল্প 'পায়ে পায়ে'তে আলোচ্য আলোচনার দিকগুলি নির্দিষ্ট আছে। গল্পের প্রকাশভঙ্গিতে দেখা যায় কথক বা গল্প লেখক নিজস্ব আমিত্বে একাকী সংলাপের দেখা আসা প্রকৃত ও সুদূর প্রকৃতির বিস্তর ব্যবধানে চেতনাপ্রবাহ উপস্থিত হয়। চেতনা প্রবাহ থেকে জানা-অজানা দেখা-অদেখার অস্পষ্ট দ্বন্দ্বে ব্যয় হয় সমগ্র রাত। 'পায়ে পায়ে' গল্প এভাবেই তার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে—

> ''তখন রাত্রি শেষ হয়নি। আমি দরজা খুলে বাইরে এলাম। সারারাত ঘুমিয়ে থাকার পর হঠাৎ চোখ খুলে তাকানোর জন্য আমার আচ্ছন্ন, অস্পষ্ট ও ঘোলাটে দৃষ্টির মতোই বাইরের গাছাগাছালি, পাহাড়, আকাশ। এদের কোনোটিকেই দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু, আমার জন্মের পর থেকে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল এই দৃশ্যগুলোই আমি দেখেছি এরাই আমার চোখের সম্মুখের একমাত্র দৃশ্য, তাই আমি বুঝতে পারছিলাম কোনটা আকাশ, পাহাড় বা গাছ। কিন্তু দূরের দৃশ্য আমার কাছে এদের একটা জটলা বলে মনে হচ্ছিল। আমি জানি, শুনেছি, ঐসব পাহাড়ে ঝরণা আছে—দেখাতে পাচ্ছিলাম না।''[৪৩]

কালিদাস অনেক আগে তাঁর 'মেঘদূতে' দেখিয়েছেন একাকীত্বের সাথে ঘর বাঁধার জীবন্ত দৃষ্টি। যক্ষ তার দূর দেশের অবস্থানে মনে মনে ছুটে চলেন তার প্রিয়ার কাছে। তাকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার বাসনায় মনের অনুচ্চারিত একাকী সংলাপে সময় করে অতিবাহিত। এক সময় দেখতে পাই তার প্রিয়ার কাছে পৌঁছনোর আকুলতার থেকে উড়ে যাওয়া মেঘের সাথে বন্ধুত্ব পাতানো বড় হয়ে ওঠে। মনের অতৃপ্ত বাসনা প্রকাশে মেঘ-ই হয়ে ঘুড়ে তার

সবচেয়ে বড় আপনজন। প্রিয়া প্রধান বিষয় হয়ে উঠলেও মেঘের সম্মুখে যক্ষের কাছে নিবেদন নিয়ে যায় দিক পরিবর্তনে। ঠিক বাসনার আপেক্ষিতা নয়, এক কল্পনার মূর্তি রোপণ করতে গিয়ে আর এক অবেচতন দিশা নিশানার ন্যায় দ্বিতীয় মাধ্যম হয়ে আসে। আলোচ্য গল্পে দিকবদলের পালা রয়েছে। গল্পকথকের মনে পড়া তরতাজা স্মৃতিতে এমনই কালিদাস সুলভ অনুভূতি প্রকাশিত হয়। মায়ের স্মৃতি ভেসে ওঠে আকাশের নীল মেঘ দেখে। স্মরণ রেখার স্তর রেয়ে রেয়ে মাকে আবার ফিরে পাওয়ার আকুতিও আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু মায়ের কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ একদিন দেখা যায় কথক তাকেই ভুলে গেছেন। মায়ের কথার থেকেও তখন আরও জরুরী হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে মনে পরা একটা ভাবনা। আর দুঃখবোধ হলে সূর্যের দিকে মুগ্ধ করে থাকা ভাবুক মন ফিরে পায় দুঃখের নিবৃত্ত। দেবেশ রায় একটা অদ্ভুদ পরিবেশ এখানে তৈরি করেছেন। গল্পের পরিবেশে যেন কোথাও মন কেমনের নস্টালজিয়া। বিষাদে ভরে যাওয়া দৈনন্দিন জীবনের পড়ন্তবেলায় তিনি কঠিন সত্যিকে এখানে দাঁড় করালেন। তাঁর ভাষাতে—

> ‘‘পথের আশেপাশে যে নানা লতাপাতা ফুল, তা দিয়ে বিকেলের সেই আশ্চর্য সূর্যের সম্মুখে বসে, সেই গভীর নীল আকাশের তলায় বসে, আমরা মালা গাঁথি, আর সেই মালা আমাদের পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়ি।’’[৪৪]

পূর্বের দুটি গল্পে চরিত্রের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তাদের নাম ধরে বারবার ধ্বনিত হয়েছে ব্যক্তি জীবনের ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ। একইরকম অনুষঙ্গ আলোচ্য গল্পে বজায় রেখে গল্পকার চরিত্রের বারবার নাম না নিয়ে তার মনের প্রসঙ্গ তুলে যাচ্ছেন। কোনওভাবে স্পষ্ট বোঝা যায় না একাধিক অতীত স্মৃতির কী কারণ হতে পারে। কেন সে ফিরে ফিরে চায় পুরনো অতীতে। আর কেন-ই বা তার মন তাকে প্রতারণা করে এড়িয়ে যায় প্রতিকার। বাউলদের মতো ঈশ্বর অনুসন্ধানী মন খুঁজে বেড়ায়, অথচ ভুগতে থাকে মনের জটিলতায়। সে যত্রতত্র চষে বেড়ায়, তাকে ছুটে মরতে হয় যেন কোন কারণ সাথে নিয়ে। এক অদৃশ্য ভাবনার সাথে স্বল্প উপস্থিতিতে কথাবার্তা বলার বর্ণনাও রয়েছে। যেমন—

> ‘‘ সে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। তাঁর দু-চোখের নির্নিমেষ দৃষ্টি আমার ওপরে। তার ঠোঁটে সামান্য হাসির ভঙ্গি। আমি ভয় পেলাম। পিছু হঠতে

গিয়ে দেখি, আমার পা সরছে না। তবে কি পাহাড়ের শুরুতে সেই ডাইনি আমার মনোহরণ করল? কিন্তু সে তো অনেক দিনের কথা। আমি এখন ইচ্ছা করতে পারছি না। আমার মন, আমার মন গেল কোথায়? 'মন, মন।''[৪৫]

নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর একটা বড় আওয়াজ উঠেছিল তৎকালীন সময়ে। অস্তিত্ব সংকটের কবলে পড়ে 'ব্যক্তি আমি'র সাথে ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়ে ছিল নিজের মন বা চেতনা। স্মৃতি বা অতীত তাই কোন এক গাঢ় অন্ধকার ছাড়া আর কোনো সুখের বার্তা দিতে পারে নি। গল্পকার দেবেশ রায় নিজেই গল্প জীবনের শুরুতে এমন চড়াই-উৎরাই পথ প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি জানেন 'নজস্ব আইডেনটিটি' নিয়ে বাঁচার তাগিদে ভুগতে হয়েছিল কত অজস্ব জীবনকে নীরবে তাদের মনের ভেতরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অদ্ভুদভাবে একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাকে বইতে বইতে ব্যক্তি মনের অবক্ষয় ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠেছিল। গল্পকার অত্যন্ত মানবিকভাবে এই চিত্রগুলি নিজের লেখক সত্তায় জড়িয়ে' পায়ে পায়ে' গল্পটি চমৎকারভাবে শিল্প সম্মত করে তুলেছেন।

ভারত সদ্য স্বাধীন হয়েছে। তার ক্ষয়-ক্ষতির পরিণাম দিন দিন বেড়ে চলেছিল অবাধ গতিতে। দেশভাগের মহাবিপর্যয়ে ততদিনে সর্বশান্ত বিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়। ১৯৬২ সালে 'উদ্বাস্তু' গল্পে দেবেশ রায় পঞ্চাশ পরবর্তী জ্বলন্ত ইতিহাসের হদিশ দিয়েছেন। দেশান্তরী মানুষদেরই এককথায় 'উদ্বাস্তু' বলা হয়। ছিন্নমূল মানুষের সব থেকে বড় ক্রাইসিস সে সময় বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তা, দেশভাগের পরিণতি। দেশত্যাগ যে কোনদিনই সুখের ছিল না, বরং তার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। আসলে 'উদ্বাস্তু' গল্প দেশ দহনের জীবন্ত প্রতীক। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভুগতে থাকা স্রোতের একটি অনুকূল ইতিহাসমালা। আত্ম পরিচিতির নির্মম শিকার হওয়া একটি মানুষের বিপন্ন কালবেলা, রাজনীতির বিপরীত আঘাত থেকে প্রশাসনিক অত্যাচারের কালবেলা—এখানে সত্যব্রত নামের ব্যক্তিটি উদ্বাস্তু নামের কবলে যেন হাতের পুতুলে পরিণত হয়। 'রক্তকরবী'র নাটকে আমরা দেখেছি সেখানে মানুষ আছে, তাদের জীবন রয়েছে; নেই কোনো আত্মপরিচয়। তবে সময়ের চোরা স্রোতে নাটক একদিন বিশ শতকের রক্ত-মাংস হয়ে উঠবে—জানা ছিল

না। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা বড় তীব্র হয়ে এখানে প্রকাশ পেয়েছে। দেবেশ রায় সারাৎসারের ভিতরে ঢুকতে বরাবরই পছন্দ করেন। তিনি এখানে ক্রাইসিসের ইতিহাসটি নির্ভুলভাবে ধরতে পেরে জানিয়েছেন, মৃত্তিকায় উৎপন্ন হওয়া বৃক্ষকেও দিতে হবে নিজের জন্ম পরিচয়; সেই মৃত্তিকায় দাঁড়িয়ে থেকে। যে পরিবারে সত্যব্রত তিলে তিলে একটু একটু করে বড় হয়েছে, সে পরিবারের মায়া কাটিয়ে তাকে ধরা দিতে হবে তার আত্মার প্রমাণ, আজ অথবা কাল। এ বিষয়কে গভীর সমস্যা বলে দেখে দিলেই হবে না, সমস্যার কাছাকাছি পৌঁছে দেখা দেবে পশ্চাশ্বের দ্বিতীয়ার্ধ আসলে এক অভিশাপে ভরা দুঃসময়। গল্পে আছে অসম্ভব গতি, একটা তাড়না খুঁজে বেড়ায় তার নিজের শরীরী পরিচয়। দেশভাগের পর গোটা সিস্টেমে যে মারাত্মক রকমের ভুল ছিল তার নির্ভুল দৃষ্টান্ত হতে পারে এ আলোচ্য গল্প। কেননা, সত্যব্রত নামের মানুষটি মারা যাওয়া সত্ত্বেও তার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় নকল সত্যব্রতদের। এই সত্যব্রতরা কোন চক্রান্ত বা কৌশলের জন্য নকল নাম ধারণ করে নি সেদিন। শুধু বাঁচার জন্য একটি মিথ্যে নাম বুকে জড়িয়ে বেঁচে থাকার দিন অতিক্রম করতে চেয়েছিল। নকল নামই হয়ে উঠেছিল তাদের একমাত্র বাঁচার অবলম্বন। দেবেশ রায় বর্তমান কালের হাল হকিকতে তুলে আনেন চলমান ঘটনার বৃত্তান্ত—

> ‘‘এমন হতে পারে বর্তমানে যে বা যারা মৃত সত্যব্রত লাহিড়ীর আত্মপরিচয় গল্প করেছে, তারা মৃত সত্যব্রত লাহিড়ীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচিত ও সেই কারণেই মৌলিক সত্যব্রত লাহিড়ীর পরিচয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলিকেও নিজের কাজে লাগাতে পারছে। মৃত সত্যব্রত মরেও জীবিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং বর্তমানে জীবিত সত্যব্রত লাহিড়ী বস্তুত মৃত।’’[৪৬]

ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে উদ্বাস্তুদের করণ জীবন চিত্র চলে যাওয়া এখানে মুখ্য হয়ে ওঠেনি। সাল, তারিখ, ইতিহাসের নথি যেন উঠে এসেছে গল্পের সূত্র ধরে। উল্লেখ্য, কল্পনাও ইতিহাসের বাস্তবতা ছুঁয়ে সত্যব্রত লাহিড়ীরা বেঁচে আছে কোনো নামধারী জীবিত মানুষের দেহে। দেশভাগের মর্মান্তিক পরিণতি কত বিচিত্র হতে পারে তার জীবন্ত রূপ বোধ হয় ‘উদ্বাস্তু’ গল্প। এ মর্মান্তিক বিপর্যয় থেকে ধর্মের বিভাজনও প্রখর হয়েছে, তার

অর্থহীন যুক্তিতে সাজা পোহাতে হচ্ছে নিতান্ত নিরীহ মানুষদের। আমত্যে এক অভিশাপের শিকার তাদের তাড়া করে বেড়ায়। গল্পকার দেবেশ বিষয়ের দগদগে ক্ষত নির্মাণে নিজেকে নিভরে নিয়েছেন, গল্পটির বাস্তবতা দাবি করে মানুষ দেশভাগের ক্ষত বুকে বয়ে একটা রাত নিজের মতো থাকতে পারেনি। অসয়ে তাদের জীবন থেকে মুছে গেছে স্বাভাবিকতার চেনা দিন। আত্মপরিচয়ের অভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে, আতঙ্ক ও বিপদের সঙ্কেত সর্বদা গায়ে মেখে থাকতে হবে বেঁচে। এ চিত্রটি গল্পকারের নিপুন তুলিতে সত্যিই জীবন্ত হয়ে উঠেছে—

> ‘‘যতদিন এই দুই প্রশ্নের উত্তর না - পাওয়া যায় - ততোদিন কোনো সত্যব্রত লাহিড়ীই নিজেকে নিঃসংশয়িত রূপে সত্যব্রত লাহিড়ী বলে ভাবতে পারবেন না, কোনো স্ত্রীই তাঁর স্বামীকে মতে পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র সত্যব্রত লাহিড়ী বলে নিঃসন্দেহ হতে পারবেন না, কোনো সন্তানই তার পিতাকে অকৃত্রিম ও আদি সত্যব্রত লাহিড়ী বলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না।’’[৪৭]

দেবেশ রায় এমনিতেই ছোটগল্পের প্রাণে প্রার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন জড় বস্তুর ভিতর লুকিয়ে থাকা নির্জীব বিষয় থেকেও। তাঁর গল্প বলার শৈলীতে এই শক্তি অফুয়ন্তভাবে বয়ে চলেছে। ‘উদ্বাস্তু’ গল্পে সচেতন পাঠক মাত্রই জানেন এখানে বিপর্যয়ের কাহিনি বপণে তিনি কল্পনার থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্মৃতিই বেশি প্রয়োগ করেছেন। গল্পের কাছাকাছি পৌঁছে সেই উপলব্ধি আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ‘রক্তমণির হারে’ গ্রন্থের ভূমিকাতে যে কথাগুলি উল্লেখ করেছেন তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরব—

> ‘‘দেশভাগ ও তার আনুষঙ্গিক বিচ্ছিন্নতা, ঘৃণা, সন্দেহ ও স্থায়ী শত্রুদেশ হিসেবে গায়ে গা লাগিয়ে সেঁটে থাকা এক শালগ্রত ভৌগোলিক ঐতিহাসিক অস্তিত্ব বা দেশ, স্পেসকে, স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গতি নেই। চার-পাঁচটি পর্বতমালা আর তিন-তিনটি সমুদ্র দিয়ে চেনা যায় এই যে প্রায় মহাদেশীয় স্পেসকে, সেই স্পেস এই গল্পগুলিতে মজে উঠেছে, ঘুলিয়ে উঠছে, পাকিয়ে উঠছে, যেন, যে-জায়গাটুকুর ঘেরে দু-

তিনজনের বেশি শ্বাস নিতে পারে না তাতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের সোয়া-শ কোটির বেশি মানুষকে। দেশহীন, স্মৃতিহীন এই আখ্যানে দেশ বা স্পেস যদি কখনো আসে, সে দেশ ধ্বংসের ছাইয়ে ঢাকা। সে-ছাই ভৌতিক অবায়ুতে ওড়ে। যদি স্মৃতি কখনো আসে, সে স্মৃতির কোনো জীবন নেই। মৃত স্মৃতি। দান্তের নরকের মত।''[৪৮]

পুরোপুরিভাবে দেবেশ রায় নিজেও দেশভাগের শিকার। তাঁকেও ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছে। রেহাই মেলেনি এই অভিশাপ থেকে। যে অভিশাপ থেকে আজও আমাদের মুক্তি নেই। 'উদ্বাস্তু' গোটা গল্প জুড়ে অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াইয়ে গল্পের চরিত্রগুলির সাথে সময়কেও বড় ক্লান্তি ও বিপন্ন করে তোলে। বড্ড তাড়াতুড়ো আর অশনি সঙ্কেতের মধ্য দিয়ে যে দিন গেছে আমাদের জীবন থেকে; সেই দিনগুলিকে সাহিত্যে প্রতিচ্ছবি হিসেবে তুলে ধরা বোধহয় খুব একটা সহজ কাজ নয়। মানুষের স্বাভাবিক গতিবিধির চরম ক্ষয়ক্ষতির দলিল ছাড়া 'উদ্বাস্তু' গল্পকে আর অন্য কোথাও অন্য পর্যায়ে ফেলা যায় না। গল্পের সার্থকতা এখানেই যে, প্রখর বাস্তবতার গভীরে পৌঁছে এই গল্প ইতিহাসের মারাত্মক বিপর্যয়কে পুনরায় হুবহুভাবে তুলে ধরে। দেশভাগের হাস্যকর পরিণতিকে রূপ দেয় অনেক যন্ত্রণা ও বেদনার রক্ত ঝরা ক্ষত দিয়ে। ছিন্নমূল মানুষের আত্মপরিচিতির চরম দুর্ভোগ পোহালেটা ছিল নিত্য দৈনন্দিন ঘটনা। দ্রুত জীবন বদলে কখনও পুব থেকে পশ্চিম আবার কখনও পশ্চিম তেখে পুব—এই দোলাচলচায় উদ্বাস্তু মানুষেরা স্থির হয়ে আশ্রয় লাভ করতে পারে নি। তবুও হাজারো বাঁধা টপকে নিজেকে নতুন করে ফিরে পাবার দুঃখ ভরা ইতিহাস এই গল্প। দেশভাগের হিংস্রতা থেকে সাধারণ মানুষের অসীম বেদনা আজও থেকে গেছে অশেষ। 'উদ্বাস্তু' গল্প তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে গতানুগতিক গল্প বলার পথে পা না বাড়িয়ে হাজির হয়েছে সত্য ঘটনা তুলে ধরতে। এখানেই আলোচ্য গল্প ছক ডেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

দেশভাগকে কেন্দ্র করে আর একটি অসামান্য গল্প 'সাত হাটের হাটুরে'। এলোমেলো ছন্নছাড়া কিছু মানুষের অশেষ বেদনার ইতিহাস রয়েছে এই গল্পে। আবালবৃদ্ধ বণিতা সর্বনাশে জর্জরিত হয়েছে। সেখানে কারও কোনো বয়সের হিসেব নেই। শিশু-কিশোর থেকে প্রবীণ

কেউ রেহাই পায়নি দেশান্তরী জীবনের পালাবদলে। একটি পরিবারের ইতিহাস তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়। একটি পরিবার আসলে দেশভাগের বিষয় হয়ে ওঠে। 'সাত হাটের হাটুরে' বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একটি পরিবারের নির্মম কাহিনী পরিবেশন করে। তেরো বছরের সাধন, তাঁর স্বামী-পরিত্যক্তা দিদি, অনিয়মিত কত রাত, অনিশ্চিত পেশা সবকিছু মিলিয়ে দেবেশ রায় অঙ্কণ করেছেন উত্তরবঙ্গের বুকে দেশভাগের ঘটে যাওয়া ইতিহাসের কথা।

বিচ্ছেদের যন্ত্রণা নিয়ে উত্তরবঙ্গে পা রাখতে দেখা যায় সাধনদের পরিবারদের। শৈশবের দিনগুলিতে সে সমস্ত ছেলে মেয়েরা তাদের রঙিন দিনগুলিতে পড়ালেখা ও শৈশবের খেলায় মেতে ওঠে, শৈশব ক্রমশ বৃদ্ধি পায় স্বাভাবিক গতিতে; সেখানে গল্পে সাধনের ১৩ বছরের শৈশবে নেমে এসেছে অকাল দুঃসময়। ফেরিওয়ালার মত পথে পথে ঘুরে বেড়ানো পেশা নিয়ে তাকে ছুটতে হয় খুব ভোরবেলা। এবং ফেরার বেলা যখন নির্দিষ্ট নয়, তখন মনে হয় খুব অপরিণত বয়সে ছিন্ন হয়ে গেছে শৈশব। খুব আশ্চর্য হতে হয় ভেবে সাধন যখন বাড়ি ফেরে তখন তার পরিবারের লোকের ঘুমিয়ে থাকে, আবার যখন কাজের সূত্রে যে বাড়িতে আসে তখনও ঘুমিয়ে থাকে। অর্থাৎ পরিবারের সবাইকে নিশ্চিন্ত মনে ঘুম উপহার দিয়ে সে নেমেছে জীবন-জীবিকার অনিশ্চিত ভ্রমণে। উদ্বাস্তু হয়ে তারা সপরিবারে চলে আসে উত্তরবঙ্গে। সাধনের দিদির স্বামী কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে কিন্তু আর কোনদিন ফিরে আসে না। দিদির এই শূন্যতা সাধনকে সহ্য করতে হয় হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মধ্য দিয়ে।

দেশত্যাগের এমন বৃত্তান্ত সাধন নিজে ধারণ করে জীবনকে উপহার দিয়েছে বিষাদে ভরা যন্ত্রণা। তাই যখন বিষণ্ণতাবোধে তার জীবন ভারাক্রান্ত সেইসব উপলব্ধিকে গান হিসেবে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হলে মনে হয় ক্ষত-বিক্ষত কালের বর্তমানকে সে প্রকাশ করে। মনে হয় এ গানে মনো মুগ্ধকর সুর আর কথা নেই, কেউ যেন চিৎকার করে বলতে চায় তার আত্ম সর্বনাশে পিসে পড়া ইতিহাস ব্যথা। সাধনের ১৩ বছরের অপূর্ণ জীবন, স্বামী পরিত্যক্তা দিদি, মা-ভাই-ছোটবোন স্বাভাবিকতা হারিয়ে মরতে আসে উত্তরবঙ্গের প্রান্তে। গল্পে একটি পরিবারের নির্ভেজাল ঘটনায় দেশভাগকে বারবার মনে পড়ে। তাদের এই ভাগ্যলিপির বিধানে কোনো ঈশ্বরের অশুভ ছায়া নেই, আছে দেশভাগের মহাবিপর্যয়ের

ছায়া। দেবেশ রায় এই সত্যি ঘটনায় চমৎকারভাবে এঁকেছেন একটি পরিবারের ঠিকানা বদলের জ্বলজান্ত করুণ কাহিনি।

'উদ্বাস্তু' গল্পের ওপিঠ বোধহয় দেবেশ রায়ের আর একটি দেশভাগ কেন্দ্রিক মন কাড়ার গল্প 'জননী! জন্মভূমি!!'। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভাবনা দিয়ে দেশভাগ কতটা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়, তবে ধর্মের ভিত্তিতে মনের সংঘাতে প্রকৃতপক্ষে দেশভাগ সফল হয়েছে—একথা আশা করি আজ সবাই স্বীকার করবেন। জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে দেশ বদলের পালা বুকে বয়ে আরেক দেশে এসে আশ্রয় খুঁজতে গিয়েও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি কোন নির্দিষ্ট দেবেশ থাকার নিশ্চয়তা। শুধু নিযুন্তর 'উদ্বাস্তু' দাগ মন ও শরীরের মেখে অযথা অনুসন্দান করতে হয়েছে আপন দেশের। দেবেশ রায় এখানে একটি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন, তাহলে সত্যি সত্যি-ই প্রকৃত দেশ উদ্বাস্তুদের কোনটা, জন্মভূমিকে চিরকালের মতো ছেড়ে আসা সত্ত্বেও নতুন দেশে নতুন করে বেঁচে থাকার ঠিকানা নাকি জন্মভূমির শুদ্ধ স্মৃতিই একমাত্র তাদের প্রিয় দেশ। ধর্ম নাকি হৃদয় কোন পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত মেলে নিতে হবে। আপন দেশ, আপন পরিচয় পর্ব। এই অস্থির দিনবদলে কোনও সমাধান ছিল না, খুঁজে পাওয়া যায়নি সন্ধানী উদ্বাস্তুদের; যারা ভিন্ন দেশকেও প্রিয় দেশ তৈরি করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান একে অপরের রক্তে লিখে গেছে হিংস্রতার নির্মম বৃত্তান্ত।

''জননী! '' 'জন্মভূমি!!' গল্পে সংকট অন্য মাত্রায় প্রকাশ পায়। নিষ্টোল গল্পত্বকে রক্ষা না করে আপাত শিথিল গ্রন্থনায় নামহীন দুটি নারী-পুরুষের থাকে কোনোভাবে মুখে ফেলতে পারে না ছবি-আঁকিয়ে মানুষটি।... হয়তো, এ-গল্পে বক্তব্যের কিছু প্রাধান্য আছে, আংশিক উঠে পড়া কেটি মানবিক প্রশ্ন দেবেশ রায় আর একভাবে এ-গল্পের পরিণামী প্রতিবেদনে তুলে আনেন—মানুষের রক্তের রঙ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে লাল। জাতিধর্মের কোনো বিভাজনরেখা রক্তের রঙে নেই, থাকতে পারে না।

গল্পে আছে একটি নামহীন মানুষ, যে মানুষ জন্মসূত্রে মুসলিম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের তাড়নায় বশবর্তী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মায়া কাটিয়ে তাকে ছাড়তে হয়েছে আপন জন্মভূমি। পাকিস্তানী মুসলিমদের কাছে অকথ্যভাবে মার খেয়ে শূন্যতা আর জীবন নিয়ে পালিয়ে

আসে। ক্রাইসেসের বুনন গল্পকার সময়ের গভীরে ঢুকে এখানে বেশি করে প্রেসার দিয়েছেন। ধর্মে মুসলিম হওয়া এই নামহীন মানুষটি নিজেকে বহুবার উদ্বাস্তু বলে দাবি করে, চেয়েছে পরিচয়পত্রের সার্টিফিকেট। মানতে চায়নি। আমাদের ধরে নিতে হবে, উদ্বাস্তুরা এই সময় চাইছিল না আবার নতুন করে কেউ উদ্বাস্তু পরিচয় দিয়ে ভিড় করুক, তারা তা চায় নি। বরং তাদের ছিন্নমূল জীবনে একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও হিংস্রতার সমান্তরাল রেখাটি কীভাবে অস্থির ছিল, তার অনুচারিত ভাষা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে কলকাতায় চলে আসার অভিজ্ঞতাটা কালের অধ্যায় হিসেবে থেকে গেল। তাকে যদি কেউ মুসলিম ভেবে কেউ খুন করত, তাতেও হতে তার মানসিক শান্তি। কিন্তু সারাজীবন নামহীন মানুষটি 'দেশ'কে কুঁজতে খুঁজতে বিবর্ণ। ব্যক্তি আমির অপমৃত্যু ঘটেছে অমানবিকভাবে। ফলে একটা আত্মহীন যন্ত্রণা তাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে। আর কলকাতাকে সে শেষ পর্যন্ত নিজের দেশ বলে মেনে নিতে পারেনি। নামহীন মানুষটি ব্যর্থ হাহাকারে ঈশ্বরের কাছে ছুঁড়ে দেয় কিছু সাহসী প্রশ্ন। তাকে বেছে নিতে হয় মৃত্যুর পথ। বিভাজন রেখার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গল্পকার 'সাত হাটের হাটুরে' গল্পে সময়ের ভাষ্যে রেখে গেলেন অজস্র প্রশ্নের দীর্ঘ তালিকা। যার রেশ হয়তো কোনোদিন শেষ হবে না।

তাঁর আর একটি দেশভাগ মূলক বিখ্যাত গল্প 'মিঠির মেজমামা'। আলোচ্য গল্পে দেশ হারানোর প্রকাশ্য যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে মাতৃভাষা নিয়ে। এখানে উদ্বাস্তু তীব্রতার থেকে ভাষা বিনিময়ের গভীর সংকট ধরা পড়েছে। পরিবর্তন ঘটেছে মানব মনের একাধিক স্তরে। মিঠিরা জন্মভূমির প্রিয় স্থান থেকে অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে ছিন্ন হয়ে বদল করে বাড়িঘর। কিন্তু হলে কী হবে, জন্মগত হিক্ষা আবহ তাদের রক্তের ন্যায় মিশে থাকে। গল্পে মিঠির বাবাকে দেখি তিনি স্থান পরিবর্তনের পর মানবিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন। ভাষা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি অহর্নিশি মানসিক অবসাদে ভাষা আওড়ান ঘুমের মধ্য দিয়েও। অর্থাৎ মিঠির বাবা দিনেরবেলা যে ভাষা বুঝে উঠতে পারেন না সেই ভাষাই রাতেরবেলা ঘুমের মধ্যে উদায়ণ করে বসেন। মানসিক চাপে বোঝা যায় তিনি মনে মনে জপ করার ন্যায় অস্পষ্ট ভাষা বারবার মাথায় ঘোরাতে থাকেন, যার ফলে রোমন্থন প্রক্রিয়া ভেসে ওঠে স্থান পরিবর্তনের মূল হেতু। জার্মানি ফেরত মিঠির মেজ মামা পূর্ব পুরুষদের ভাষা, মৈমনসিংহের

উপভাষা বলা শুরু করলে এক স্বপ্রচালিত ভাষার ব্যবহার বলেই মনে হয়। মিঠির বাবা এবং মামার এই অবস্থান আমাদের বুঝিয়ে দেয় পিতৃভূমি হারানোর মাঝে মাতৃভাষা বাঁচিয়ে রাখার যন্ত্রণাও দেশভাগ থেকে লাব করতে হয়েছে। নিজের ঐতিহ্য ধরে রাখার গল্প বোধহয় 'মিঠির মেজমামা' গল্প। গল্পকার দেবেশ রক্তপাত বা স্থনা পরিবর্তনে হাহাকার ও কালবেলার মাঝে দেশভাগের থিম অবলম্বন করে প্রকৃত ক্ষত দিকটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি হয়তো আলোচ্য গল্পের আবেদনে বলতে চান আঘাতের ক্ষত স্থান শুকিয়ে গেলেও আঘাতের দাগ রয়ে গেল আজীবন। মিঠির বাবা এবং মিঠির মেজাজে তার চরম দৃষ্টান্ত।

'একই উপকথার দুই আরম্ভ' দেবেশ রায়ের একটি অন্যতম বিখ্যাত গল্প। গল্প নির্মাণ প্রক্রিয়ায় দেবেশ রায়কে ঘুরে ফিরে একাকী সংলাপ সেখানে আশ্চর্যজনক ভাবে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। এই গল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। দাঁড়িয়ে থাকা চলমান জীবন পথে একটি মানুষের বিবর্তন-আবর্তন চিত্র তাকে নিয়ে যায় জীবন সংগ্রামের চড়াই-উৎরাইয়ে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে নামহীন লোকটির পরিবর্তন ধারাই। এ গল্পের মুখ্য বিষয়।

গল্প অগ্রসর হওয়ার নির্দিষ্ট পথে লোকটিকে দেখা যায় নিজের সাথে নিজের কথা বলতে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে মনে হয় জীবিকা ও বাসনার ব্যবধানে যথেষ্ট ফারাক তিনি এখনও আবিষ্কার করতে পারেন নি। ঋদ্ধন্দ্যবোধ নিয়ে থাকা স্বাভাবিক শূন্যতা তার ধরা হয়নি এ পর্যন্ত। গল্পকারের মতে—

> ''মাইলের পর মাইল শূন্য সমলতায় সাড়ে-তিন হাত মানুষের খাড়া দাঁড়ানোও ত আকাশের বাজ, তীরের ফলার মত সূচ্যগ্র চিহ্নিত করে দেয়—সেই মানুষটির ভেতর দিয়েই বজ্রপাত ঘটে যায়। কিন্তু ওখানে ঐ জোয়ারের সরতে থাকা জল আর সামনে স্থল ভূমিতে কতই ত উচ্চতা ও নম্রতা ছিল। তার শরীর ঘিরে সমুদ্রের ঢেউ ছিল না ঠিকই যদিও তার শরীর ঘিরে যে অবকাশ ছিল, তাতে সমুদ্রের ঢেউয়ের স্মৃতি ছিল। আকাশ ছিল তার মাথার উপরে। তার সামনে ছিল স্থলভূমি। এত কিছুর মধ্যে সে তার দাঁড়ানো-টুকুকে খুঁজে নিতে পারছিল না।''[৪৯]

এই হলেন গল্পকার দেবেশ, যিনি উপমাও মূল বক্তব্যের মিশ্রণে ক্ষণে ক্ষণে জীবন্ত

ছবি কথার মতো বর্ণনা করে ফেলেন একটি জীবনের অজস্র কথা, দু-এক কথার আঁচড়ে। পৃথিবীর মধ্যদেশ ভেদ করে যাওয়া চান্দ্রেয় চুম্বকের যে আকর্ষরে মৃত্তিকা ফুলে উঠতে চায় আর জল তার তরলতার সুযোগে মাটির সঙ্গে সম্পর্ককে ছিন্ন করে হতে চায় একটা আশ্রয়ের পথ, এখানে মনে হয় মাটি জলকে আগলে রাখে না, যেন জল নিজেই তার একমাত্র আঁধার হয়ে উঠবে। এই টানের প্রক্রিয়া ঐ লোকটি সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে নিজের সাড়ে তিন হাত ভূমিতে বইয়ে দিয়েছে। আত্মদর্শনের উপলব্ধি থেকে মেলাতে পেরেছে পৃথিবীতে অবস্থিত তিনভাগ জলরাশি এবং নিজের ভিতরে বসবাস করা অগাধ জোয়ার। অনুসন্ধান ও আত্মবিশ্বাসে ভর দিয়ে সে দেখেছে জলের ওপর ভর দিয়ে দিয়ে পথ অতিক্রম করা পায়ের উপর ভর দিয়ে হয় নি, নিজের ভিতরের তরলের বেগকে মন্থনে জারিত করেই সম্ভব হয়েছে।

গতি ও আলোড়নের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করতে তাকে এভাবেই আত্মদর্শন প্রয়োগে এগিয়ে যেতে হবে। সে-সংজ্ঞার নেই কোথাও কোনো সমর্থন। পরিগ্রহণেও সেখানে সমর্থনের উপস্থিতি লক্ষিত হয় না। ফলে তাকে তার সমস্ত চেতনা প্রয়োগ করে সংজ্ঞাটিকেই প্রাণবাণ করতে করতে হতে হবে অগ্রসর। গল্পের ভিতর ডুবে থাকলে সম্মুখীন হতে হয় মগ্নতা, তন্ময়তা, কল্পনায় চিত্রিত করা ভাবনার। দেবেশ রায়ের লেখক সত্তয় অন্তর্গত রক্তের ভিতর যে প্রবাহ রয়ে যায়, যে জলবায়ুর সহযোগে তিনি গল্প নির্মাণ করেন 'একই কথার দুই আরম্ভ' তার অনেকটা নিকটবর্তী। গল্পে রয়েছে সেই গভীর থেকে গভীরতর সমুদ্র, আকাশ, শরীরের দূরগামী অভিযান কথা—

> ''শরীরের সমুদ্রকে বাইরের সমুদ্রে মিশিয়ে যে- লোকটি সমুদ্র পেরল—এবার শরীরের আকাশকে ও শরীরের মাটিকে বাইরের আকাশ ও বাইরের সঙ্গে মিশিয়ে সে এই কাদা মাটিতে শকুন ও কুকুরদের সঙ্গে জিততে পারবে।
>
> পিছনে অপস্রিয়মান সমুদ্র, সামনে কিছু কাদা গড়িয়ে যাওয়া, জল ঝরে যাওয়া মাটি আর মাথার ওপরে সর্যোদয়ের আগের ঘোলাটে আকাশ নিয়ে লোকটি খুঁজছে তার শরীরের ভিতরে কোথায় আকাশ

আর কোথায় মাটি।''[৫০]

ঠিক অতৃপ্ত বাসনাও বোধহয় নয়, বাসনাকে অতিক্রম করে জীবন জিজ্ঞাসার সরল পথে তাকে খুঁজে নিতে হবে পরশ-পাথর। কাদা-জল সরিয়ে জেগে ওঠার গন্ধে থাকতে হবে বিনিদ্র রাত্রি জাগরণ। সমগ্র গল্পের পরতে পরতে ঐ ব্যক্তিকে ছায়ার মতো শুধু প্রত্যক্ষ করেন নি গল্পকার, প্রত্যক্ষ ও বর্ণনা এ—সর্বোপরি দর্শনের ভিতর দিয়ে তুলে এনেছেন একটি নামহীন ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসার বোবা সংলাপ। তার আদি-মধ্য-অন্ত্যে ঐ ব্যক্তিকে কখনও কথক বা গল্পলেখক বলে মনে হয়। হয়তো 'একই কথার দুই আরম্ভে' থেকে গেল ঐ ব্যক্তি ও গল্পকারের একই ব্যক্তির দুই ভিন্ন মেরু।

শ্রেণি সচেতনতা, শ্রেণি সংগ্রাম, শোষিত-শোষক এবং পেষক-পেষিত সংঘাতের বিবিধ বৃত্তে নির্মাণ-বিনির্মাণের অবধায়িত গলিতে বেছে নেওয়া হয় যেসব গল্পকে, তারা আমাদের ভাবনার প্রবাহে তরজ তোলে অনেক সময়, সেই তরঙ্গের পূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয় সাহিত্যে। কিন্তু শ্রেণি চেতনা দিয়েই একমাত্র বাস্তবকে নির্ণয় করা যায় তা নয়, বাস্তবের আছে আরও বহুবিধ প্রসার। আছে রামধনু ন্যায় মনের নানারকম অনুরণন। বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণি সংঘাতের প্রকাশ একেকজন একেক রকমভাবে করেছেন। তার মধ্যে দেবেশ রায়ের গল্পে শ্রেণি সচেতনতার আছে একটি নির্দিষ্ট পরিভাষা। তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলির আবেদনে শ্রেণি সচেতনতার উপস্থিতি একেবারেই নেই। শুধু 'সমবেত সচেতনতার 'একটি নির্দিষ্ট সুর বয়ে যাচ্ছিল ধারাবাহিকভাবে। নতুন রীতির খোঁজে, নতুন প্রকরণের অনুসন্ধানে দেবেশ রায় একদিন লিখলেন 'বেড়ালটির জন্য প্রার্থনা গল্প। গল্প নির্মাণে বিবর্তনের ধারায় আলোচ্য গল্পটি তার গল্পকার সত্তায় নতুন মোড় রূপে পরিচিতি লাভ করল।

আত্মকথন রীতিতে বয়ে চলে কথকের মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ব্যাকুল তৃষ্ণা। তৃষ্ণার প্রসঙ্গ দিয়ে গল্পের আরম্ভ বহু অতীতের আদিম দুনিয়ায় নিয়ে গিয়ে আদিম যুগের প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। বেড়ালের প্রতীক যেন এখানে সেই আদিম তৃষ্ণার জোয়ার। কথকের মতে, 'একটা প্রচণ্ড তৃষ্ণায় আমি ছটফট করছিলাম সারাটা দুপুর। কতবার জল খেয়ে, কিংবা কোনো তান্ত্রিক ভদ্রলোকের 'ধর্মমূলক' লেখা পড়ে, অথবা চুপচাপ শুয়ে থেকে, সেই তৃষ্ণাটাকে মেটাতে চাইছিলাম, কিন্তু সে-পিপাসা কিছুতেই দূর হল না।' কথকের মনে-

মেজাজে তৃষ্ণার প্রতিধ্বনি প্রতিনিয়ত গল্পে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। একটি বেড়াল যেমন খাবারের লোভে রান্না ঘরের দরজা খুলে ঢোকে, সমস্তটা চারিদিকে দেখে নেয় লোভের চোখ দিয়ে। তেমনি কথকের এই লোভের সাথে সাদৃশ্য তৈরি হয় তৃষ্ণা ধরে রাখার গতিতে। তার পিপাসা তার গোটা শরীর জুড়ে, সারাটা পৃথিবী জুড়ে, পিপাসার দুই তীরে দাঁড়িয়ে সে ফারাক করে নিতে পারে দুই ভিন্ন মেরুরু। সে আলাদা আলাদা করে মিলিয়ে নেয় থাকা না থাকা 'তৃষ্ণার তুফান, প্রবল ঢেউ, খরস্রোত, পেনিল আবত'।

মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় চেতনাপ্রবাহ, শ্রেণি সচেতনতার দিকগুলি এবার তুলে ধরা যাক—

১. ''আমি এই ভেবে খুশি হলাম—অন্ধকার আর আলোর দুটো ঢেউ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তীব্র আবেগে ভেঙে পড়ছে দিনান্তের তীরে আর সেই আলিঙ্গন থেকে ছিটকে দু-চারটে আলো কণায় এ গল্পটি আলোকিত। সে-আলোতে আমার নায়িকাকে পরম সুন্দর মনে হবে নিশ্চয়ই।''[৫১]

২. ''চরাচরের একটি জীব হিশাবেই আমি তৃষিত। আর এই বিশেষ সময় আর বিশেষ সময়ের পৃথিবী আমাকে তৃষ্ণা মেটানোর জনয টেনে এনেছে এই মেয়েটির বাড়িতে, তার মায়ের দকে চাইলাম—এই চরাচরের একটি জীব হিশাবে ভদ্র মহিলাও এই তৃষ্ণার তৃপ্তি খুঁজছিলেন, তাঁর সময় আর পৃথিবী তাঁকে গৃহিণী করে ছিল, তিনি তৃপ্ত হয়েছেন, তবু বেঁচে আছেন, কী হিষাবে? মানুষ? নাকি দাঁড়ানো পশু?''[৫২]

৩. ''আমরা পরস্পরকে ডাকি, সাড়া দিই, তারপর বেঁচে থাকি, বেঁচে থাকতে হয় আর এই সময়টা যেন একটা নদী, এই যেন একটা নদী, বিরহের।''[৫৩]

তৃষ্ণার ম্যারাথন দৌড় থেমে গিয়ে কথকের মনে জন্ম নেয় একটি শুদ্ধা প্রার্থনা 'ব্রহ্ম সংগীতের সুরের সঙ্গে' মিশে যায়। সেই বেড়াল আদি পশুত্ব থেকে মুছে যাক অন্ধকার তৃষ্ণার জয়যাত্রা। রাতের উন্মত্ততা যেন আর ফিরে না আসে। সেই প্রার্থনা লেখা আছে বেড়ালটির জন্য 'শীতের রাতে উনুনের পাশে নিশ্চিত ঘুম। আর যেন জেগে থাকতে পারে সন্ধ্যাকালের বিশুদ্ধ স্নিগ্ধতায়। এভাবে মানুষের মনে পাশবিক তার সাথে সংঘাত চলে, পাশবিকতা শেষ পর্যন্ত পরাজয় মেনে নেয় মানবিকতার কাছে। পাশবিকতা মানবের মনে

ঘর বেধে তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য শাসন করলেও শেষ পর্যন্ত সব বাঁধার মোহ কাটিয়ে জয় ঘটে মানবকতার।

'ইচ্ছামতী' নামটার সাথে নদীর সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যদি বলি নদী তাহলে, নদীর জলধারা তার খেয়াল খুশি বয়ে যায়, বয়ে যেতে চায় দূর-দূরান্তরে কোথাও সমুদ্র তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে বলে। নদীর জলধারা আর জীবনের গতিপথে কোথাও অমিল দেখতে পান না গল্পকার দেবেশ রায়। নদীর ভেতরেও প্রাণ চঞ্চল একটি বাসনা আছে, আছে মিলিত হওয়ার পূর্ণ বাসনা। আলোচ্য 'ইচ্ছমতী' নামধারী গল্পটি দুটি নর-নারীর সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম মন নেড়ে চেড়ে দেখার গল্প। এখানে প্রেম-ভালোবাসা থেকে বিবাহ বন্ধনের ভাঙাগড়া হিসেব আছে। আছে প্রেমকে সব কিছুর উর্দ্ধে নিয়ে গিয়ে দুটি মানুষের চাওয়া-পাওয়ার একমাত্র ভাবনা হয়ে ওঠে।

দীপক-উমার হালকা চালে মেলামেশার আবহ দিয়ে গল্পের শুরু। তাতে সময় অতিবাহনের জালে তাদের সম্পর্কের চাপা পড়ে থাকা সম্পর্কগুলো ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। দীপকের একবার মনে হয় উমার মাঝে মাঝে আসার কারণ-ই বা কী, কেন অযথা সে উমার জন্য অপেক্ষা করে-এ অপেক্ষার পরিণতি যদিও কোনোদিন বদলে যাবে না বিয়ের পিঁড়িতে। তাদের একে অপরের বিবাহ হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই, তবু তারা হাঁটে অজান্তে, সম্পর্কের খাঁটি টান থেকে।

মনস্তত্ত্ব বোধহয় কোথাও দুটি নারী-পুরুষের স্বভাবে ঢেউ খেলে যায় বারবার। প্রকাশ না করার ব্যস্ত তাগিদে। অবিবাহিত জীবনে প্রেম-ভালোবাসার ঠিকানা যখন চিরদিনের জন্য পৌঁছতে চায়। সাতপাকে বাধায়, তখন চেতনাপ্রবাহের একটা তরজ মনে-মননে কাজ করে। কল্পনা ও স্বপ্নের যাত্রাপথ মাটিতে নামার মতো জড়াতে চায় বাস্তবকে। সম্পর্কের গভীরতা কখনও হতাশায় ভোগে, কখনও যোগ-বিয়োগের মত হ্রাস-বৃদ্ধির খেয়ালে আলো-আঁধার খেলে। এখানে দুটি দৃষ্টান্ত দিলে 'ইচ্ছামতী' গল্পের মূল সুর ধরা যাবে—

১. '' 'তবে আমি যখন বলি আমাদের কোনোরকম ভবিষ্যতের কথা না-ভেবে চালিয়ে যাওয়া উচিত—তখন যে বড় বলা হয় জীবন থেকে পালাচ্ছ। জানো উমা, আমার না ইচ্ছে করতে সবচেয়ে ভয় করে' দীপক একটা বেঞ্চির সামনে দাঁড়িয়ে বলল—এসো,

এখানে একটু বসা যাক।

'না' ঐ দূরের বেঞ্চটাতে' ''[৫৪]

২. ''আমরা যে-রকম আছি, সে-রকমই থাকব। আমি আমার বাড়িতে, তুমি তোমার বাড়িতে। কিন্তু দরকার হলেই আমি তোমার কাছে যেতে পারব, তুমি আমার কাছে আসতে পারবে।''[৫৫]

'ইচ্ছামতী' অস্তিতেবর বহির্মুখী সংকটকে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করে, পেঁয়াজের খোসার স্তরের মতো মেলে মেলে দেখে জীবনের প্রকৃত রাশিফল। তাদের নিত্য নৈমিত্তিক দিনে দেখা করা, কথা বলা, ভাব বিনিময় করার ফাঁকে ফাঁকে জন্ম নিয়েছে মিলনের পাশাপাশি অনিয়শ্চতায় কালো মেঘ, সমস্যা সমাধানের পথে বিচরণ করতে করতে তারা খুঁজে পেয়েছে সমস্যা সংকুল দীর্ঘ তালিকা। প্রেম-ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখার এমন ধীর-স্থির সিদ্ধান্ত আমাদের শেষ পর্যন্ত আশ্বস্ত করে, তারা বেছে নেয় বিবাহের পথ, যাতে কোনোদিন একাকীত্বের যাতনায় পুড়ে মরতে না হয়। অজস্ব ঝড়ের সম্মুখীন হয়েও তারা জয়ী হয় দুটি মনের সুন্দর বোঝাপড়ার মিলনে। বাস্তবের চাপ যতই প্রখর হোক, উমা-দীপকের সম্পর্ক তবুও অক্ষয়, অপরাজেয়—এখানেই গল্পটির সার্থকতা।

দেবেশ রায়ের ছোটগল্পকে বিবিধভাবে নিভরে চেতনাপ্রবাহ, নিঃসঙ্গতা, শ্রেণি সচেতনতার দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখা গল্পগুলির গন্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখেছি তিনি প্রত্যেকবার গল্পের কনটেনটাকে অতিক্রম করে নির্মাণ করেন আরও এক নতুন সৃষ্টির পথ। 'জলধর ব্যানার্জির মৃত্য' গল্পটির কথা বললে বিষয়টি আমাদের গোচরে আসে। মৃত্যু চেতনার তারা, মৃত্যু ভয়ের ছমছমে গল্প নয়, মৃত্যুকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি না করার মানবিক অবক্ষয় বোধহয় এই আলোচ্য।

সাতান্ন বছরের জলধর বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সাধারণ, বাঙালি মধ্যবর্তী বাঙালির বাড়িতে আছে দুটি ছেড়ে, একটি পুত্রবধূ, স্ত্রী ও বিবাহিতা কন্যা। গোটা পরিবারের প্রধান সবাইকে রেখে মারা গেলেন। সব চেয়ে আশ্চর্যের, নিঃসঙ্গভাবে বেঁচে থাকার মাশুল তাকে দিতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এমন এক জাতের মানুষ ছিলেন, 'যাদের বেঁচে ছিলাম' কথাটা ঘোষণা করার জন্য মরা ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকে না। ফলে জলধর

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লোকেরা সংসারের বোঝা হয়ে থাকেন আজীবন, সংসারের বোঝার ভার নীরবে বাড়িয়ে চলেন।

এক জীবনে অসাড়ের মত একটা অপদার্থ বেঁচে থাকা ব্যক্তিগত সংবিধান নিয়ে তারা জীবন অতিবাহিত করেন। তাদের জীবনে কোনোদিন সূর্য ওঠে না, জীবনের ওঠা-পড়া প্রকৃতপক্ষে কী তারা জানেনা; মানতেও চায় না। গল্পকার এমন জীবনের গলিতে নিয়ে যেতেও আমাদের দ্বিধা করেননি। কারণ তিনি মনে করেন গল্প নির্মাণে কোনো সীমাবদ্ধ রেখা হয় না। সীমাবদ্ধ রেখার মধ্যে হোক বা বাইরে তিনি ছিনিয়ে আনেন জলধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লোকেদের। আর আমাদের গল্পচ্ছলে পাঠ দান করে যান। অন্ধ ধারণায় জীবন ব্যয়ের আশ্চর্য গল্প এই 'জলধর ব্যানার্জির মৃত্যু' গল্প।

চিকিৎসকে আমরা ভগবানের দ্বিতীয় রূপ বলেই জানি। তার ঔষধ ও সেবার দৌলতে প্রাণ সংশয় প্রাণও ফিরে আসে কখনও কখনও। অথচ সেই চিকিৎসকই যদি কখনও নিজের অসুখের শিকার হন, তাহলে তার অবস্থার চিত্র কেমন হতে পারে, তিনি যদি আবার হয়ে থাকেন চরম পর্যায়ে একগুঁয়ে—ফলে অসুখ নিয়ে স্বয়ং একজন ডাক্তারের টানাপোড়েন আমরা লক্ষ করি 'রক্তের অসুখ' গল্পে।

'দেবেশ রায়ের গল্পে : নির্মাণের কথা' প্রবন্ধে রামকুমার মুখোপাধ্যায় 'রক্তের অসুখ' গল্পকে যথার্থই বলেছেন যে—

'' 'রক্তের অসুখ' গল্পটির যে নান্দনিক অভিযান তা স্পর্শ করতে হয় নির্মিতির বহুস্তরিক ভাষা বিন্যাসের ভেতর দিয়ে। শব্দ ও উপবাক্যের গূঢ়ার্থ কাহিনির চূড়ান্ত ভাবগত বিজ্ঞপ্তিতে পাঠককে এগিয়ে নিয়ে চলে। নদীর বহমান স্রোতের মতো কাহিনি এগিয়ে যায়, কিন্তু ছোট ছোট ঘূর্ণির মতো কিছু শব্দ এই অবিরাম চলার ভেতরে পাক খায়। ঐ শব্দ ঘূর্ণির আবর্তনে হয়তো আমরা পৌঁছে যেতে পারি কাহিনির বিস্তৃত মোহনায়।''[৫৬]

একজন চিকিৎসকের মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ সেবনের ফলে নিজের অসুখ বাঁধানো, সেই অসুখ থেকে রক্তহীনতার শিকার ঘটে গেল রক্তের চাহিদা, রক্তের অনুসন্ধানে আত্মীয়-পরিজনদের কাছে অনুরোধ, তাদের প্রত্যেকের রক্তের যোগান সন্ধানে অহর্নিশি ভোগান্তি, সত্যিকারের দুঃসময়ে বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের এড়িয়ে যাওয়া—কাহিনি গড়াতে গড়াতে

একজন বেড়ালের উপস্থিতি গল্পটির প্রকৃত নির্যাস প্রকাশ করে। শরীরে দীর্ঘ দিন ধরে ব্যথা অনুভূত হওয়ায় চিকিৎসক অনবরত খেয়ে যাচ্ছিলেন একটার পর একটা ওষুধ। গল্পের মূল আবেদন বোধহয় এখানেই যে, একজন প্রকৃত ডাক্তার হয়েও তাকে ভুলে যেতে হয় ওষুধই তাকে হয়তো একদিন কুরে কুরে শেষ করে দেবে। ওষুধের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার মারাত্মক হয়ে তাকে ভোগাবে আজীবন। একসময় দেখা যায় তার শরীরে বদলাতে থাকে রক্তের গড়ন, রক্ত তৈরির উপাদানে বিপর্যয় ঘটে। ডাক্তারের শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ভঙ্গুর হয়ে পড়তে থাকে দিন দিন। গল্পের অন্যতম প্রধান মোচড়ে আসে সেই ক্ষণ যখন 'ইচ্ছা আর শক্তির ভেতর সব সংযোগ কেটে যায়।' রোগের ভিতরে পৌঁছতে গিয়েও বিভ্রান্তি তাড়া করে। এর উৎস রক্তের বীজে, নাকি জন্মগত রক্তপ্রবাহে? আবার কারো মতে তাকে অসুখ গ্রাস করেছে মাস কয়েক থেকে। চেতনা হারানোর দিনও খুব শ্রীঘই এসে উপস্থিত হয়। ভেতরে জমিয়ে রাখা যে কথাগুলি চিকিৎসক বলে ওঠেন অবেচনে তাঁর কোনো অর্থই ধরা পড়ে না। সেখানে অতীতের কোনো চাপা যন্ত্রণা নাকি ভবিষতের আফশোস খেলা করে। বিচ্ছিন্নতাবোধের অতলে এক আবহ তৈরি হয়, একটি মানুষের এমন বিশৃঙ্খল জীবনযাপনের কারণ স্পর্শ করেও যেন ধরা যায় না, তিলে তিলে নিজেকে শেষ করার মূল হেতু বর্তমানের উচ্চারণ কিন্তু তার ভেতরে বর্তমান নিহিত নেই। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেমন 'ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে নড়ে, তার 'ইচ্ছা আর শক্তির ভেতর' যেমন 'সব সংযোগ কেটে যায়', তেমনি তাঁর উচ্চারণ এবং উচ্চারণে বিষয়ের ভেতর কাল দূরত্ব গড়ে ওঠে।

খসে খসে পড়া স্তরের পতন ক্রমেই গল্পে অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয়। গল্পের সমস্ত মন জুড়ে ডাক্তারের খামখেয়ালির ভুলে ভরা জীবনকে কেন্দ্র করে বন্ধু-বান্ধব, পরিজন এবং চিকিৎসা পদ্ধতির দৌড়ঝাঁপ গভীরভাবে ধরে রাখে পাঠককে এবং বিষাদে ভরিয়ে তোলে। গোটা গল্পে ঘটে যাওয়া করুণ দশার দিকে এবার একটু আলোকপাত করব। যে উপলব্ধিতে সারাৎসার আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে—

১. ''চিকিৎসা চলছে। কী অসুখ নয় জেনেও চিকিৎসা। কার চিকিৎসা না জেনেও চিকিৎসা। কোথায় চিকিৎসা না জেনেও চিকিৎসা।''[৫৭]

২. ''একটু থেমে কমল আবার এক গাল হেসে বলে, 'আমার রক্তও মিলল না। হে

হে' যেন তার রক্ত ডাক্তারবাবুর শরীরে ঢোকাতে পারলে খুব ফুর্তি হত।... মায়া হাত ধরে একটু হেসেছিল। কাকীমার চাউনি দেখে হাসিটা বন্ধ করে। এই দলটির রোগীর পাঁচ ডাক্তার সহকর্মী, ধোপ-ভাকা জামা-কাপড়ে, একজনের ধুতি-পাঞ্জাবিতে, মাথার পেছনের পাতলা চুলে, গায়ের নাইনলের গেঞ্জিতে, গোল পাকানো গল্প গুজবে, মনে হচ্ছিল, এঁরা কোথাও বেড়াতে এসেছেন।''[৫৮]

৩. ''এই দৃষ্টি পাতের কোনো অর্থ কোনো একদিন হয়তো ছিল, সেই অর্থের সন্ধানে অন্তত কয়েক মুহূর্ত ভদ্রলোক তাকিয়ে থাকেন সেই অস্বচ্ছ, অনড়, দৃষ্টির সামনে। তারপর বহুদূর থেকে যেন জিজ্ঞেস করেন, 'কেমন আছো সুনৃতা—' কণ্ঠস্বরে বা উচ্চারণে কোথাও কোনো মিথ্যা ছিল না, ছিল বহু স্মৃতির রণন, এই হাসপাতাল অভিনয়-সন্ধ্যা মিথ্যা হয়ে যায় স্মৃতির মুহূর্ত স্থায়ী প্রবল বন্যায় পারিপার্শ্বিক লুপ্ত হয়, কুশল প্রশ্নের আধ্যাত্মিকতায় ছেয়ে যায় বাঁচা-বাঁচানোর দৈনন্দিন।''[৫৯]

দেবেশ রায় গল্পের কঠিন সত্য স্বীকার করে জানিয়ে দেন 'রক্তের অসুখ'-এর ভয়াবহতা -এর সর্বনাশী দীর্ঘ ভ্রমণ বৃত্তান্ত। হাসপাতালে সচরাচর সচরাচর সময়ে-অসময়ে ডাক্তার না থাকার সমস্যা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অন্দর গল্পকার আমাদের প্রত্যক্ষ করাল জীবন সংশয়ের আত্মিক কালবেলায়; যেখানে আমাদের ফর্ম প্রেক্ষিতহীন, আমাদের মন ও শরীরের ভাষা বর্ণহীন, সামাজিক একাধিক দুঃসময়ে আমাদের উপস্থিতি দায়বদ্ধহীন। অসুখ রক্তের শিরা-উপশিরায় এবং সেই অসুস্থের লক্ষ্য হয়ে পড়ে এক ব্যক্তি থেকে অজস্র ব্যক্তির শরীরে। 'রক্তের অসুখ গল্পকে স্বয়ং একজন ডাক্তারই সহজভাবে মৃত্যু পথযাত্রীর ঠিকানা বলে দিয়েছেন। ডাক্তার ও রোগীর মাঝে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের বিপদ সঙ্কেত কপালে লিখেও শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছেন ডাক্তার সেজে থাকার জেদ। মনের অসুখে বিষ মন্থন করার গল্প 'রক্তের অসুখ'।

সাংবাদিকতা এবং একজন কবি-সাহিত্যিকের মধ্যে বোধহয় খুব একটা পার্থক্য নেই। কোনো সাংবাদিক যখন তার ক্যামেরার সহায়তা ছবি তোলেন। সেখানে কল্পনায় মিশে যায় ছবির সৌন্দর্য, সেখানে চোখের দর্শনে ভেসে ওঠে ছবির গুরুত্ব—নির্বাক হলেও ছবির গতি থাকে চলমান। আর কবি-সাহিত্যিকেরা তুলনা সাংবাদিকের সাথে সেই অর্থে

প্রাসঙ্গিক বলা যায়। দেবেশ রায় কর্মসূত্রে সাংবাদিকের ভূমিকাতেও বিচরণ করেছেন, ফলে সাংবাদিকতার একটা অভিজ্ঞতা তিনি প্রয়োগ করবেন এ বোধহয় খুবই স্বাভাবিক। সাংবাদিকদের সংবাদ প্রদর্শনে জীবিকা কীভাবে, কখন, কেন ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর চরাচর করে, তার হদিশ দিতে চেয়েছেন গল্পকার। তাঁর সরাসরি অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে এমনই স্পর্শকাতর একটি গল্প 'বৃষ্টিবদল'।

'বৃষ্টিবদল' গল্পের নির্মল ঘোষ একজন ব্যর্থ ক্যামেরাম্যান থেকে প্রোডাকশন ম্যানেজারে পরিণত হয়। সাদা-কালো ছবি তোলার দিন শেষ হয়ে এলে নির্মল ঘোষের দিন শেষ হয়ে যায় একজন কযামেরাম্যান পেশা। ফিল্মের আলোর ব্যবহার সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা না থাকায় তার মনের ভেতর একটা চাপা যন্ত্রণা বুয়ে যায়। তাই তাকে মাঝে মাঝে কাল্পনিক ক্যামেরার সাহায্যে চারিদিক প্রত্যক্ষ করে আবার ক্যামেরা থেকে সচেতনভাবে সরে আসতে হয়। চলচিত্রের 'ব্লু' ফিল্মের নগ্নতা ধরা পড়ে। প্রসাদ ও নির্মলের ক্যামেরার লেন্স ফিল্মের নীল নগ্নতার মুখোশে পা রাখে। পেশার খপ্পরে পরে অপরাধ বেছে নেয় অপরাধ না ভেবেও। 'মুখের দরদাম' ছোটগল্পেও ক্যামেরা নিয়ে দেবেশ রায়ের রাখটাকহীন সাহসী চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। প্রোডিউসার প্যাটেল রিপোটার কনক এবং ক্যামেরাম্যান প্রিয়বদন চরিত্রকে লক্ষ্য করা যায়। প্রিয়বদন তার স্ত্রীর সাথে বিহারের পারারিয়া গ্রামের গণবর্ষণের ঘটনার অ্যাসাইনমেটে কাজের সূত্রে যেতে হয়, কিন্তু ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া হয় না, কারণ ঐ ছবি পারারিয়া না গিয়েও দেওয়া যাবে। কারণ, ক্যামেরা দিয়ে দ্বিতীয়বার মেয়েগুলোকে দেখতে পারবে না। দ্বিতীয়বার দেখার অর্থ আর একবার সচেতনভাবে ধর্ষণ করার স্বরূপ। গল্পের পথে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয় এই উপলব্ধি আমাদের চেতনায় বিবেক হয়ে দাঁড়ায়। গল্পকারের ভাষায়, 'ক্যামেরা দিয়ে আর মেয়েগুলোকেই আরেকবার ধর্ষণ করতে চাই না। ক্যামেরাও ত একটা পুরুষাঙ্গ।' এ গল্প কোনো রূপক নয়। খোলামেলাভাবে প্রকাশ করে অপরাধের বিশেষ দিক। চেতনা দিয়ে সবকিছু বিচার করলে রাজহংসের ন্যায় বেরিয়ে আসে অপরাধ ও মানবিকতার দুটি ভিন্ন দিক। মানবিকতার খাতিরে তাই 'মেয়েগুলোকে' ধর্ষিতা চোখে না দেখে দেওয়া হয়েছে তাদের আত্মসম্মান। দ্বিতীয়বার ধর্ষণের হাত থেকে তারা মুক্তি পেয়ে বদলে দেখেছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এখনও দাঁত-নখ

বের করে হিংস্র হয়ে পড়েনি। গল্পকারের চোখে এখনও এই পৃথিবী মানবিকতার পক্ষে দিন অতিবাহিত করে। 'মুখের দরদাম' ভয়ঙ্কর স্থির সত্যে পৌঁছে দিয়েও জীবনেরই জয়গান করে।

'জীবনানন্দের মুখ' গল্পে আবার বিজ্ঞাপনের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে বিজ্ঞাপন জগতের অন্দরে গিয়ে। জীবনানন্দের কবিতা দিয়ে ডিটারজেন্টের বিজ্ঞাপন বিসয়ে যখন আলোচনা চূড়ান্ত হবার দিকে তখন আধুনিক সভ্যতার অবক্ষয়ের দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ তাঁর কবিতার ভুবন জুড়ে আমৃত্যু যে কবিতা দেবীর আরাধনা করে এসেছেন তার মূল্য একদিন আধুনিক পৃথিবী এভাবে বিচার করবে তা হয়তো জানা ছিল না স্বয়ং আধুনিক কবিরও। গোপা, শুভম, অরিন্দমরা আধুনিক যুগের শিক্ষা নিয়ে নিজেদের গড়ে চলেছে বর্বর যুগের মানসিকতায়। স্বভাবতই, 'জীবননান্দের মুখ' গল্প বিজ্ঞাপনের সর্বনাশা রূপটি তুলে ধরে। বাণিজ্যিক জগৎ নতুন প্রজন্মের স্বাভাবিকতা ক্ষয় করে চলেছে, এ গল্প তারই চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

'মুখের সত্যমিথ্যা' গল্পে সুভাষ নামক এক ব্যক্তির দশটা-পাঁচটার গতানুগতিক জীবন দৃশ্য প্রকাশ পায়। একখেয়ে জীবন একখেয়ে বোধ করে সুভাষ আরও বেশি করে যখন গেটের পাশে কণ্ডাক্টরের পিছনে বসার একটা জায়গা পায় আর এই রোজ বাসে জাওয়ার জনয মনে মনে বেড়ে ওঠে এক অপরাধবোধ। তার ধারণা অন্যদের তুলনায় সে বেশি সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছে। বাসের ওই একই সিটে বসে তাকে পেসেঞ্জারের ওঠা-বসা দাঁড়ানোর ভিড়ে নানাভাবে অসুবিধা ভোগ করতে হয়, এই ভেবে যে অন্য কাউকে সে কষ্ট দিয়ে ফেলছে না তো। দ্বিধার গোলোক ধাঁধায় পথ হারানোর সুভাষকে বড়ই এলোমেলো বলে মনে হয়। অফিস যাওয়ার কর্মমুখর মনস্ক সময়টা তার কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে লড়াই করে বেঁচে থাকার মতো বলে মনে হয়। প্রতিটি অনিশ্চিত ক্ষণ তাকে যন্ত্রণায় ভোগায়, তাড়নায় ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। হঠাৎ একদিন একটি দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি মারা যাওয়ায় তার গতানুগতিক জীবনে চলাপেরার যানটি বন্ধ হয়ে যায়। মৃতদেহটির পাশে না গিয়েও সুভাষ দেহটির মুখ দেখে উঠতে পারে না, আশঙ্কা আর আতঙ্ক তাকে গ্রাস করে নেয়। আত্মবিশ্বাসের টানাপোড়েনে সুভাষের প্রতিটি মুহূর্ত অনিশ্চর্যতার মধ্যে কাটে। সুভাষ নামতে

নামতে হারিয়ে ফেলে জীবন যাপনের স্বাভাবিক গতিপথ। আলোচ্য গল্পে গল্পকার সুভাষের স্বাভাবিকতার ভাঙন দেখিয়েছেন সময়ের কাছে দাসত্ব মেনে। জলবায়ু ও জীবনের গতিপথ ঠিকঠাকভাবে উপযুক্ত, না হলে তার পরিণতি সুভাষ হয়ে ওঠে। আমরা তাই প্রত্যক্ষ করি গল্পকারের জন্মানো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

'মুখের সত্যমিথ্যা' গল্পের ওপিঠ বোধহয় 'বত্রিশ আঙুলে' গল্প। আলোচ্য গল্পের শ্রীশ গাঙ্গুলি সবার চোখে অপয়া, তার মনে হয় দিনের শুরুতে তার মুখ দর্শন করলে নাকি মানুষের তার মনে হয় দিনের শুরুতে তার মুখ দর্শন করলে নাকি মানুষের দিনগুলো অশুভ ছায়ায় ভরে যাবে। শ্রীশ কিন্তু হাল ছেড়ে না দিয়ে নিজের কাছে প্রতিনিয়ত প্রমাণ করতে চায় সে অপরা নয়। কিন্তু পাড়ার ছেলে বিশু তার রেজাল্টের দিন সকাল সকাল শ্রীশ গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা বলে এবং দেখা যায় রেজাল্টের ফলাফলে সত্যি সত্যি অশুভ ছায়া নেমে আসে। তারপর থেকে শ্রীশ নিজেকে নিয়ে ছেড়ে দেয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সরে যেতে থাকে সবার নজর এড়িয়ে। আত্ম বিশ্বাসের বন্ধন ছিন্ন করে সে আর নতুন করে কিছু ভাবতে চায় না। তার অন্তরের সত্তা আর সে পরস্পরের সঙ্গী হয়, মাঝে মাঝে তার মনে হয় সবাই যেন তাকে বন্দী করে রেখেছে। নিজের কাছে হেরে যাওয়া শ্রীশ গাঙ্গলী অশুভ মুহূর্ত দেখার ভয়ে নিজের মেয়ের বিয়ের পর আশীর্বাদের সময় পালিয়ে যায়। একটি অসম্ভব মনে কাড়ার গল্প হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত এই 'বত্রিশ আঙুলে'। 'অন্ত্যেষ্টির রীতিবিধি' বিবিধ গল্প অধ্যায়ের একটি আশ্চর্য মেলবন্ধন। টানাপোড়েন, প্রতীক্ষা, দৈহিক শক্তির মধ্যবর্তী ক্ষণে দাঁড়িয়ে সামাজিক বাস্তবতার নির্ভুল দলিল এই আলোচ্য গল্প। ছোটগল্পটিতে কোনো গল্প চোখে পড়ে না। কিন্তু চল্লিশ পাতা জুড়ে প্রায় সতের হাজার শব্দ পদে পদে বিন্যস্ত করে, সেই বিন্যাসের ভেতর নানান যতিচিহ্নের চড়াই-উৎরাইয়ের ভেতর দিয়ে যে শিল্প অভিজ্ঞতায় লেখক আমাদের পৌঁছে দেন তা কবিতা নয়, নাটক নয়, প্রবন্ধ নয়, উপন্যাস নয়, 'বড়গল্প' নয়। কাহিনি বলতে প্রথম পর্বে একজন বৃদ্ধের হৃৎপিণ্ড ধীরে ধীরে চারপাশের মানুষের সামনে থেমে যাওয়া, তৃতীয় পর্বে সেই মৃতের ইরেন্টোবাসী কন্যার ছুটে আসার জন্য প্রতীক্ষা এবং 'মারা যাওয়ার পরেও এই অপেক্ষা শুরুর আগে পর্যন্ত' দ্বিতীয় পর্বের অনির্দিষ্ট সময়। অবশ্য এই পর্ব ভাগটাও রীতিমত অনিয়মিত কারণ কোনোটাকেই খেলার প্রতিযোগিতায়

যে অর্থে শুরু বা শেষ আছে সেভাবে ভাগ করা যায় না। কাহিনিটি শেষ হয় প্রতীক্ষায়, শোকের অসম্পূর্ণতার ভেতর দিয়ে।

প্রাকৃতিক নিয়ম, শাস্ত্রীয় বিধি আর সামাজিক বাস্তবতার টানাপোড়েনে গল্পের বিধিলিপি একটি সম্পূর্ণ অবয়বের দিকে ঘূর্ণন করে। মৃত্যু থেকে মৃত্যু শোক কিছু সময়ের মধ্যে বদলে যায় শোকের বাড়িতে। তবুও গল্পের আবেদনে দুর্ভাগ্যের কাল ঘনঘটা, কিন্তু এ বাড়িটা তবু কিছুতেই সম্পূর্ণভাবে শোকের বাড়ি হয়ে উঠতে পারে না কারণ মৃত্যুর ইতিহাসটি রয়ে গেছে অসম্পূর্ণ বলে। 'টুনি এলে শোক হবে' বললেও ও রকমই শোনায় এমন একটা আশ্চর্য কথা শুনে যে যার মতো করে তার অর্থ রুখে নেওয়ার চেষ্টা করে। উত্তর না মেলার অচেনা অজানা পৃথিবীতে বিচরণ করে 'অন্ত্যেষ্টির রীতি বিধি'। দেবেশ রায় এই জন্যই একজন বড় লেখকের সম্মান আদায় করতে পেরেছেন, প্রকৃতির মতো তাঁর গল্পগুলিও নিয়তি নির্দেশিত পথে পূর্ব পরিকল্পিত চেনা ছক বা গল্প বলার দক্ষতায় থেমে থাকে না, চলে রাত-দিন হওয়ার মতো প্রকৃত নির্দেশিত সময় ঘূর্ণন পথে।

তাঁর লেখক সত্তা অন্যান্য লেখকের তুলনায় এই জন্যই বোধহয় আরও বেশি করে ব্যক্তিগত, খুব বেশি প্রাইভেট। কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচন করে গল্প লিখলে তিনি সেই ব্যক্তির মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত কোনোটাও বাদ রাখেন না, নিঃসঙ্গতায় ডুবতে কোনো ব্যক্তি যদি একাকীত্বে বিভোর হয়ে থাকেন তাহলে তিনি এঁকে দেন তাঁর জীবন যাপনের জীবন পঞ্জিকে—এক আশ্চর্য শিল্প দক্ষতায়। তিনি যা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে চান তার আদি-মধ্য-অন্ত্য নিঙড়ে তার নির্যাস সঁপে দেন গল্পের ভুবনে। এই বিবিধ অণু অধ্যায়ে একেকটি গল্পের আবেদন একেকরকম। কারোর সঙ্গে কারোর দূত্ব বহুদূর আত্মার সেই অর্থে নয়ও। সৃষ্টির ক্ষেত্রে আগাগোড়াই তিনি নিজেকে বারবার ভেবেছেন, নিজের সৃষ্টিকে নিজেই অতিক্রম করে আর একটি ভিন্ন ইমেজ তৈরি করেছেন। ফলে বিবিড় এই অধ্যায়ে তাঁর বলার ধরণে নানারকম উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি। পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া ও ঘটে চলে নাগরদোলার সন্ধান পাই। এই বিবিধ ছোটগল্প পর্ব আসলে নানা দেবেশ রায়ের একখানি মালা।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, দেবেশ : সম্মাননা সংখ্যা, কঙ্ক, চতুর্দশ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৪২১, সম্পাদনা - সুভাষচন্দ্র ঘোষ, স্বপন পাণ্ডা, দেবাশিস রায়, উৎপল সাহা, কলকাতা-৫৯, পৃ. ১৪৯।

২. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১৩।

৩. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩৬।

৪. ডেগর, নমলা সংখ্যা, ২০০৬, সম্পাদক, নিখিলেশ রায়, সিঁড়িভূল, পৃ. ১৩২।

৫. তদেব, : পৃ. ১৩৪।

৬. তদেব, : পৃ. ১৩৫।

৭. তদেব, : পৃ. ১৩৬।

৮. তদেব, : পৃ. ১৩৭।

৯. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫০।

১০. তদেব, : পৃ. ৫৫।

১১. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০।

১২. তদেব, : পৃ. ৯৬।

১৩. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪।

১৪. তদেব, : পৃ. ৩৬।

১৫. তদেব, : পৃ. ৩৮।

১৬. তদেব, : পৃ. ৩৯।

১৭. তদেব, : পৃ. ৪০।

১৮. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৬৮।

১৯. তদেব, : পৃ. ৮৫।

২০. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১২।

২১. তদেব, : পৃ. ২১৯।

২২. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮।

২৩. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৭।

২৪. তদেব, : পৃ. ১৯৫।

২৫. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ২৪৫।

২৬. তদেব, : পৃ. ১৫৪।

২৭. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড, পল. ১৮।

২৮. তদেব, : পৃ. ১৪৩।

২৯. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৬।

৩০. তদেব, : পৃ. ১১৫।

৩১. তদেব, : পৃ. ১১৮।

৩২. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০৮।

৩৩. তদেব, : পৃ. ২১৯।

৩৪. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮৫।

৩৫. তদেব, : পৃ. ১৮৬।

৩৬. তদেব, : পৃ. ১৮৬।

৩৭. তদেব, : পৃ। ১৯০।

৩৮. তদেব, : পৃ. ১৯২।

৩৯. তদেব, : পৃ. ২১৩।

৪০. তদেব, : পৃ. ২১৫।

৪১. তদেব, : পৃ. ২১৮।

৪২. তদেব, : পৃ. ২১৮।

৪৩. তদেব, : পৃ. ২৪৮।

৪৪. তদেব, : পৃ. ২৫০।

৪৫. তদেব, : পৃ. ২৫৫।

৪৬. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪১।

৪৭. তদেব, : পৃ. ৪৩।

৪৮. রায়, দেবেশ (সম্পা), : রক্তমণির হারে, ভূমিকা, পৃ. ২৫।

৪৯. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১০৪।

৫০. তদেব, : পৃ. ১০৯।

৫১. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৩।

৫২. তদেব, : পৃ. ২৩১।

৫৩. তদেব, : পৃ. ২৩৫।

৫৪. তদেব, : পৃ. ২৪৪।

৫৫. তদেব, : পৃ. ২৪৬।

৫৬. রায়, দেবেশ : সম্মাননা সংখ্যা, কঙ্ক, চতুর্দশ সংখ্যা, 'দেবেশ রায়ের গল্প : নির্মাণের কথা', পৃ. ২০৫।

৫৭. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৯।

৫৮. তদেব, : পৃ. ২৩৮।

৫৯. তদেব, : পৃ. ২৩৬।